নাট্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার

(সূচনা পর্ব থেকে বিশ শতকের সাতের দশক)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি এইচ. ডি

উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

করবী সরদার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখর কুমার সমাদ্দার

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০ ০৩২

২০২৪

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

‘নাট্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার (সূচনা পর্ব থেকে বিশ শতকের সাতের দশক)’ Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out unde the Supervision of **Dr. Sekhar Kumar Samaddar**, Professor, Dept. of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

সূচনাকথা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এম ফিলের কাজ করতে এসে প্রথম নাট্য সমালোচনা বিষয়টি নিয়ে আকৃষ্ট হই। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ইদানিংকালে তার পুরোনো ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নানা দিকে প্রবাহিত হলেও বাংলার থিয়েটার চর্চার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস এখনো প্রণীত হয় নি। অথচ একমাত্র উপযুক্ত সমালোচনা-প্রতিক্রিয়াই পারে থিয়েটারের চলমান এবং নিত্য পরিবর্তনশীল রূপের কিছুটা হদিশ আগামী দিনের জন্য তুলে রাখতে। ইতিমধ্যে নানা সমালোচনার কিছু সংকলন প্রকাশিত হলেও ধারাবাহিকভাবে এর মাধ্যমে থিয়েটারের স্রোত-প্রতিস্রোতের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় নি। এই গবেষণা সেই চেষ্টার একটি প্রাথমিক উদ্যোগমাত্র।

এই কাজে আমরা জরুরি সংকলন গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সাহায্য যেমন নিয়েছি তেমনি নানাজনের আলোচনা অথবা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয় অংশও ব্যবহার করেছি। আমরা লক্ষ করবার চেষ্টা করেছি শুরুর দিন থেকে বাঙালির নাট্যচর্চা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক এবং শৈল্পিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছে। এই আলোচনায় আমরা সূচনাকাল থেকে গত শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত এই প্রবাহকে বিশ্লেষণের যে চেষ্টা করেছি, পরবর্তী কোনো গবেষণায় নিশ্চয়ই নতুন শতাব্দী ও বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার নাট্যপ্রয়াস ও তার রূপান্তরের ইতিহাস আলোচিত হবে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রায় যাবতীয় তথ্য সংকলনে নিরন্তর কাজে লেগেছে কলকাতার নাট্যবিষয়ক পঠন ও চিন্তনের একমাত্র প্রায় প্রতিষ্ঠান নাট্যশোধ সংস্থানের গ্রন্থাগার ও অভিলেখ্যাগারটি। কিছু সহায়তা পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার থেকে। বাকি কৃতিত্ব জানাই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক- প্রাবন্ধিক, নাটককার-নির্দেশক- অভিনেতা ড. শেখর সমাদ্দারের। তাঁর ইতিহাস চেতনা, বাংলার নাট্যচর্চার প্রায় সব

বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অধ্যবসায়। সর্বোপরি ঐতিহ্যসচেতন দৃষ্টিতে তাঁর বিশ্লেষণের আধুনিকতার সুফল তাঁর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই পেয়ে থাকে, আমার সবিশেষ সৌভাগ্য তাঁর অধীনে যথাক্রমে এম ফিল ও পি এইচ ডি-র গবেষণার পাশাপাশি আমি তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'আভাষ দক্ষিণ কলকাতা'-র একজন নাট্যকর্মী হিসাবে কাজ করেছি। আভাষের মূল্যবান গ্রন্থাগারটিও আমাকে নিরন্তর উপাদান জুগিয়েছে। এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় স্যরের পরামর্শক্রমে এবং সতর্ক পর্যবেক্ষণে রচিত হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। স্যরকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত এলাকা বাংলার নাট্য-সমালোচনা। আমার এই অভিসন্দর্ভ যদি সেই অঞ্চলে কিছু সংযোজন ঘটাতে পারে, তাহলেই এই প্রয়াস সার্থক হবে।

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	:	নাট্যসমালোচনার ভূমিকা, সামাজিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব	পৃষ্ঠা ১
প্রথম অধ্যায়	:	প্রথম যুগ থেকে গণনাট্য পূর্ব বাংলা থিয়েটারে পত্রপত্রিকায় নাট্য সমালোচনা	পৃষ্ঠা ১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার, সমাজ-রাজনৈতিক গুরুত্ব	পৃষ্ঠা ৪৩
তৃতীয় অধ্যায়	:	পাঁচ ও ছয়ের দশকের গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য সমালোচনা : নির্বাচিত প্রযোজনার ভিত্তিতে	পৃষ্ঠা ৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	সাতের দশক, মতাদর্শের থিয়েটার ও তারপর	পৃষ্ঠা ১২২
পঞ্চম অধ্যায়	:	আট দশক থেকে নতুন শতাব্দীর নাট্যচর্চা, সমালোচনার অভিমুখ	পৃষ্ঠা ১৫৮
গ্রন্থপঞ্জি	:		পৃষ্ঠা ১৬৫

প্রস্তাবনা

নাট্যসমালোচনার ভূমিকা, সামাজিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব

রুশ ভাষাবিদ সঙ্গীতজ্ঞ এবং পর্যটক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) ২৫ নং, ডোমতলা স্ট্রিটে (বর্তমানে এজরা স্ট্রিটে) জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়িতে তৎকালীন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের থিয়েটারের স্থাপত্যকে অস্বীকার করে 'নিজদেশীয় ও দেশীয়'[১] স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে যে বেঙ্গলি থিয়েটার স্থাপনা করেন এবং তাঁর বাংলা ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সহায়তায় এম এ জোদরেল প্রণীত যে 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের অভিনয় করেন যথাক্রমে ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ এবং ২১ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে[২] সেখান থেকে শুরু করলে বাংলা থিয়েটারের বয়োক্রম আজ অবধি দাঁড়াবে ২৩০ বছর। পণ্ডিতেরা যেমন মনে করেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পূর্বে একধরণের প্রাদেশিক নাট্যচর্চার অস্তিত্ব ছিল,[৩] আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' (আনুমানিক কাল ১ম-৩য় খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রণীত ও রূপায়িত হয়ে ভারতীয় নাট্য একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করল, এবং তাও মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের অভিনয় মারফত, তেমনি আমরা বলতে পারি, এদেশে ইংরেজ আগমনের আগে যে নাট্যচর্চা ছিল, তা আমূলে বদলে না গিয়ে কখনো বহিরঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গে, কখনো বা উভয়ে মিলে মিশে, সময় ও সমাজ-সংপৃক্ত হয়ে এক অত্যাশ্চর্য অভিযাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল লিয়েবেদেফ-উত্তর কালে।

এই দুশো ত্রিশ বছরে বাংলা নাটক, বাঙালির নাট্যচর্চা, এবং তৎসংলগ্ন স্মৃতিকথা, তথ্যসংকলন কম হয়নি। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা থিয়েটারের সমালোচনার কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তার কারণ হিসাবে অনেকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। বক্ষ্যমান গবেষণা তার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে বার করতে চায়। আমরা বলতে চাইছি, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে

বারবার নানা রকমের পালাবদল ঘটেছে। যে প্রয়োজন বা তাগিদ থেকে লিয়েবেদেফ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, সেখান থেকে বাবু থিয়েটারের নানা পর্যায়ে নির্দিষ্ট আয়োজকদের তাগিদ আলাদা আলাদা ছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া থিয়েটার তখনও আনুষ্ঠানিকতার বাইরে জনসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়নি যদিও বাবু থিয়েটারে এবং এমন কি সখের থিয়েটারেও নানাভাবে সমাজ সম্পৃক্তি ঘটেছে (প্রসঙ্গত ১৮৫৪-য় রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের কথা বলা যেতে পারে) প্রধানত এই সংযোগ থেকেই নাট্য সমালোচনার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। প্রথম যুগের পত্রপত্রিকায় যে খবরগুলো বেরিয়েছে, তাদের সঠিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ "নাট্য-সমালোচনা" বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমত, আমাদের আলোচনায় আমরা মুখ্যত যে প্রসিনিয়াম-নির্ভর থিয়েটারকে নির্দিষ্ট করতে চাইছি, তার চর্চার ইতিহাস একরকমের নয়, একই উদ্দেশ্য অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি বা সামাজিক প্রেরণা সঞ্জাত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৮৩১ থেকে ১৮৭১-অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৬৮)এর 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১) থেকে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২-এ চিৎপুরের ঘড়িওয়ালা বাড়িতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'এর দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব পর্যন্ত তথাকথিত 'বাবু থিয়েটার'-এর সমাজ-বাস্তবতা ও নান্দনিকতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে 'ন্যাশনাল'-উত্তর ব্যবসায়িক থিয়েটারের সমাজ-বাস্তবতার ফারাক ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, নান্দনিকতার প্রশ্নে আমাদের হয়তো কিছুটা থমকে দাঁড়াতে হতে পারে। এই দুই যুগের নাট্যরচনা ও নাট্য-উপস্থাপনার মধ্যে বস্তুত কতখানি বদল ঘটেছে, তা একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাতেই স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব একমাত্র সেই অভিনয়ের উপযুক্ত সমালোচনার সহায়তায়। তাছাড়া লিখিত নাটক এবং প্রযোজিত নাট্যের তফাৎ সম্পর্কে সচেতনতা তখনও নাট্য সমালোচনায় প্রত্যাশিত ছিল না। নান্দনিকতা বলতে বোঝাতে চাইছি অভিনয়

শিল্পের সামগ্রিক আলোচনা তখন দুর্লভ ছিল, মুখ্যত বাচিক আবৃত্তির গুণাগুণ নিয়েই কথা বলা হত। [৩এ]

তৃতীয়ত, অভিনয়কলা, যা থিয়েটার নামক শিল্পমাধ্যমের আসল ভরকেন্দ্র, তার নিপুণ ও নিখুঁত সমালোচনা কি আদৌ করা সম্ভব? এক্ষেত্রে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)-এর যুগ থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)-এর যুগ পর্যন্ত নাটকের রচনা, অভিনয়, কর্মাধ্যক্ষতা ও নাট্যশিক্ষকতায় সক্রিয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৫-১৯৩৪) *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর*[৪]- এর সম্পাদকের এই মন্তব্য – অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'অভিনয়কে তো আর কলে পুরিয়া রাখা যায় না'। গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের সময়ে কথাটা সত্যি ছিলো। তাঁরা তখন ধ'রেই নিয়েছিলেন, 'দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়'। একমাত্র উপায় হয়তো ছিল লেখা; তবে লিখে যে অভিনয়ের কতটা প্রকাশ করা যায় তাও সন্দেহের অতীত নয়। তাই গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে যে-সব লেখা আমরা পাই, তার অধিকাংশই হয় স্তুতি নয় নিন্দা, উচ্ছ্বাস বা বিদ্রূপ।

সম্পাদকের এই বিচার আংশিকভাবে নিশ্চয় সত্য, কিন্তু সর্বৈব নয়। আমাদের প্রথম অধ্যায়ে যেখানে আমরা ১৮৩১ থেকে ১৯৪৭ অবধি বিস্তৃত সময়কালে সমালোচনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করব, সেখানে প্রসঙ্গটি আলোচনা করব। কিন্তু এইখান থেকে আমরা আমাদের চতুর্থ অনুধাবনায় যেতে পারি যে-

চতুর্থত, পৃথিবীর কোনো দেশেই যেমন শিল্পসৃজনের একটি নির্দিষ্ট রূপ বা রীতি নেই, কেবল প্রবণতা আছে, তেমনি তার সমালোচনারও একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা হয় না। অথচ আমরা জানি, আচার্য ভরতের 'রসবিকল্প' অথবা 'ভাবব্যঞ্জক'[৫] অধ্যায়গুলিতে নাট্যের যে গুণাগুণ প্রদর্শিত হয় তা মুখ্যত নাট্যকর্ম-উপভোগের একটি তত্ত্বগত কাঠামো গড়ে তোলার জন্য। ভরতের বহুপূর্বকালে গ্রিক নাট্যবিদ-দার্শনিক আরিস্ততল (৩৮৪-৩২২খ্রিঃপূঃ) তাঁর *পোয়েটিকস* গ্রন্থে ট্র্যাজেডির যে রূপলক্ষণ বিশ্লেষণ করেন, তাও মূলত অভিনীত নাটকগুলির 'টেক্সট' ও তাদের অভিনয়

নিরীক্ষণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ নাটকের তত্ত্বকাঠামো নির্মাণ করা সমালোচকের একটা প্রধান কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় এই তত্ত্বকাঠামো প্রণয়নের কোনো প্রবণতা না সাহিত্যে, না শিল্পে– কোথাও নেই। ফলে এখানে সমালোচনা শব্দের অর্থ ভিন্ন। আমরা আজো পর্যন্ত হয় প্রাচ্য নতুবা পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পের বিচার করে থাকি। তাই, বাংলা অভিধানও 'সমালোচনা' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণে বড়োই কৃপণ। কেউ যদি সৌজন্যবশত ভেবে থাকেন, 'সমালোচনা' অর্থ হল 'সম-আলোচনা' অথবা 'সম্যকরূপে আলোচনা'-তাহলে সে সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে অভিধান বলছে- 'দোষ-গুণের সম্যক বিচার, সাহিত্যশিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিশ্লেষণ'[৬] 'দোষগুণের আলোচনা বা বিচার'[৭]।

ফলত, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা বা শিল্প-সমালোচনার অর্থ যদি এমন না হয়, হয় যদি কেবল দোষ ত্রুটির বিচার-বিশ্লেষণ, তখন আমাদের মনে পড়তেই পারে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) রচিত *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকের উৎসর্গপত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০) প্রাণাধিকেষু'কে লেখা এই পঙ্‌ক্তিগুলি-

মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'।
শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে'।

কেহ বলে, ‘আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,

চিরদিন রবে না তা ব’লে’।

কেহ বলে, ‘এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা

হ’ত যদি অন্য কোনোরূপ’।

যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,

আমি শুধু বসে আছি চুপ।[৮]

খুব সম্প্রতিকালে, যাকে আমরা “Cultural Studies” বা ‘সাংস্কৃতিক পাঠাভ্যাস’ বলি, সেখানে নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পাঠ্যক্রমে যথাক্রমে U G 1.1 পাঠ্যক্রমে ‘প্রবেশিকা’ অংশে এবং PG পাঠ্যক্রমে বিশেষ বা Optional Paper-এ যারা নাটক ও নাট্যবিষয়ে পড়াশুনো করে, তাদের “নাটক-দর্শক সম্পর্ক” নিয়ে পড়ানো হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মতো করে একটি নাট্যপ্রযোজনা দেখে তার সমালোচনা লেখেন। প্রাচ্য নাট্যাদর্শে যেখানে মূলত নাট্যের রসাস্বাদনের ওপরে জোর দেওয়া হয় সেখানে পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচনা অনেকখানি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে একটি নাট্যকর্মের বিচার করে দেখতে চায়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ বা Case Study দর্শককে শিক্ষিত করে। J.L.Styan (1923-2002) প্রায় একক উদ্যোগে ইউরোপ ও আমেরিকার থিয়েটারের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে।[৯] তাঁর আলোচনায় তিনি সবিশেষ জোর দিয়েছেন মঞ্চ ও দর্শকের সম্পর্ক-সংযোগ বিষয়ে।[১০] আমরা এও জানি একটি সংকলনে গ্রিক ট্র্যাজেডি থেকে শুরু করে আধুনিক আমেরিকান নাটক পর্যন্ত প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু নাটক, তার রচয়িতা, তার সমকালের রঙ্গমঞ্চ, তখনকার সমাজ ও সময়, এবং আধুনিককালে সেই নাটকের কোনো প্রযোজক-পরিচালকের সাক্ষাৎকার, তার প্রযোজনার খুঁটিনাটি নিয়ে বই পশ্চিমে প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে।[১১] একমাত্র কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩২-২০২১)-এর *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* [১২] বইটিকে সরিয়ে রাখলে বাংলা থিয়েটারে মূলত ইতিহাস, স্মৃতিচারণা, ব্যক্তির মহনীয়তা প্রতিপাদন বা সংকলনের বাইরে এইরকম সমালোচনা-পর্যবেক্ষণ আজো বিরল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা, যা কিনা এই অভিসন্দর্ভের মুখ্য প্রতিপাদ্য, তার পূর্বে পর্যালোচনা করব বাংলা থিয়েটারের সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত সমালোচনার চারিত্র্য ও তার গতিপ্রকৃতি।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে আমরা জানি। স্বাধীনতা পূর্বকালের বাংলা থিয়েটারের সমালোচনা নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত আলোচনার পরিসর অনেক দূর অবধি চলে যেত, যা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের আলোচনা মুখ্যত গণনাট্য-গ্রুপ থিয়েটারের ধারা নিয়ে, ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত প্রবাহিত সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে নয়। লক্ষ করা যেতে পারে, পরেও আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্য নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি।

স্বাধীনতাকাল নয়, আমাদের বিবেচনা গণনাট্যের নাটক, যার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, সেই 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা থেকেই আমরা আমাদের আলোকপাতের চেষ্টা করেছি।

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে কিছু জরুরি সূত্রোল্লেখ প্রয়োজন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আজ এই নতুন শতাব্দীতে ইন্টারনেট এবং গুগুল অথবা উইকিপিডিয়া-র ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সেখানে নাট্য-সমালোচনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, নাট্যসমালোচনা একটি নাটকের, যা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরন হিসাবে লিখিত হয়েছে, তার মঞ্চগত রূপের বিশ্লেষণ করে করা হয়ে থাকে। সমালোচক নাট্যটি সম্পর্কে একটি সাধারণ সচেতনতা গড়ে তোলেন। তাঁর কাজ বস্তুত দর্শককে নাট্যকর্মটির গুণাগুণ বিষয়ে সচেতন করে তোলা।[১৩] *নিউ ইয়র্ক টাইম আউট* পত্রিকার নাট্য

সম্পাদক ডেভিড কোট আরো বিশদে বলেছেন, আমরা খুব গুরুগম্ভীর চালে অথবা খুব বোদ্ধার মতো সমালোচনা লিখি না, খানিক হালকা চালে নাট্যদৃশ্যগুলি অনুধাবন করে নির্মাতার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, সৃজনধর্মী ভাবনার তীব্রতা এবং দর্শককে আনন্দদানের ক্ষমতাকে উৎসাহিত করি।[১৪] বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এরকমটাই ঘটেছে কিনা, আগামী অধ্যায়গুলিতে তার সন্ধান মিলবে।

উৎস ও টীকা

১) সরকার, সলিল, জানুয়ারি ১৯৯২, *২৫ নং, ডোমটোলা স্ট্রিট : কিছু তথ্যানুসন্ধান*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ২, নৃপেন্দ্র সাহা প্রমুখ (সম্পা), পৃ ২০।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ১৬।

৩) "...এটা নিশ্চিত মনে হয় যে, ভরত ও সংস্কৃত নাটকের বহুপূর্বে উপভাষায় নাট্যাভিনয় হত এবং সেইগুলির বিরুদ্ধেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে নালিশ করতে গিয়েছিলেন। "রঙ্গাচার্য আদ্য, 1975, *ভারতীয় থিয়েটার*, অনুবাদ মিত্র অরুণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা ৫।

৩[এ]) ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পলাশীর যুদ্ধ'-র সমালোচনা, দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, অগাস্ট ১৯৮২, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১ম খন্ড, পৃ ১৪৬-৪৭।

৪) মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, নভেম্বর ১৯৯১, *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর*, মজুমদার, স্বপন (সম্পা), প্যাপিরাস সংস্করণ, পৃ ২৩।

৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (অনু), মার্চ ১৯৮০, *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*, ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, পৃ ১৩০-১৯৩।

৬) *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, মে ১৯৯৯, পৃ ৭৭০।

৭) বসু, রাজশেখর, (সং), নতুন মুদ্রণ ১৪০৫, *চলন্তিকা*, পৃ ৬৮০।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শ্রাবণ ১৩৯৩, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সুলভ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৩৪।

৯) a) Styan, J.L., *The Dramatic Experience*, 1971, Cambridge University Press.

b) Do, Modern Drama in Theory and Practice, 1981, Vol I-III, Cambridge Univrsity Press.

১০) Do, *The Dramatic Experience*, 1971, Cambridge University Press., PP 15-17.

১১) Goodman, Randolph, 1961, 1978, *Drama on Stage*, Colombia University.

১২) ঘোষ, শঙ্খ, ১৯৬৯, ১৯৭৮, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং।

১৩) নাট্যসমালোচনা কী?

- ***Theatre criticism*** is a genre of arts *criticism*, and the act of writing or speaking about the performing arts such as a play or opera. ..So the literary craft gives birth to a stage production. Likewise a *criticism* of a written play has a different character from that of a *theatre* performance.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_criticism

নাট্যসমালোচকের কাজ কী?

- A **theater critic** analyzes given works of drama. Most often, this analysis is in written form and appears in print or digital media. In addition to providing literary interpretation, the writings of a theater critic help raise general awareness about theater among readers.
- https://en.wikipedia.org>wiki>Theatre_criticism.

কেন নাট্যের সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন?

- The **critic** is the advocate for the audience. ... **Critics** can help on audience digest what they're seeing. Sure, sometimes they can be, and

sometimes their words are hard to read, but they are absolutely necessary.

- https://en.wikipedia.org>wiki>Theatre_critiocism.

১৪) An interview with *Time Out New York* theater critic David Cote.

https://en.wikipedia.org.

প্রথম অধ্যায়

প্রথম যুগ থেকে গণনাট্য পূর্ব বাংলা থিয়েটারে পত্রপত্রিকায় নাট্যসমালোচনা

বলাবাহুল্য, 'প্রস্তাবনা' অধ্যায়ে "নাট্য-সমালোচনা" বলতে যে ক্রিয়াটিকে, যে কৃত্যটিকে, যে অনুষ্ঠানটিকে আমরা নির্দিষ্ট করতে চেয়েছি, সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছি, তার কোনো অস্তিত্ব উনিশ শতকের শুরুতে থাকবার সম্ভাবনা ছিল না। সামগ্রিকভাবে থিয়েটার, বিশেষত বাংলা থিয়েটার নিয়ে খুব গভীর পর্যবেক্ষণ ও যথার্থ ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা দিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে[১] পৌঁছে। এর একটা কারণ নিশ্চয় এই যে সারাজীবন ধরে অসংখ্য নাটকের অভিনয়, অভিনয়-শিক্ষকতা, নানা মঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং মোট সাতাত্তরটি নাটক রচনা ও প্রযোজনা সম্পন্ন করে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ উনসত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করলেন। তার এগারো বছর পর, যেভাবে গিরিশচন্দ্র একদা পার্কার কোম্পানির বুককিপারের চাকরি ছেড়ে পূর্ণ সময়ের জন্য থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে ইংরেজি অধ্যাপনা ছেড়ে পূর্ণ সময়ের জন্য থিয়েটারে এলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। যেভাবে ঐতিহাসিক বলেছেন-

> সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমাদের দেশে বাঙলা এবং ইংরেজিতে অনেক নাট্যাভিনয় হয়েছে সত্যি, কিন্তু আমাদের বৃহত্তর জনসমাজ এ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। যাত্রা-কবিগানের মতো থিয়েটারকে তারা তখনো নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ বলে ভাবতেন না... সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এইসব শৌখিন অভিনয়ই অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরি করেছিলো, মঞ্চ বিষয়ে অভিজ্ঞতা দিয়েছিলো, নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিলো।[২]

এই বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা নানা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে নাট্যের আলোচনা-পর্যালোচনাকে চারটি বিভাগে বিন্যস্ত করছি- ১) শৌখিন মঞ্চের কাল, ২) ন্যাশনাল থিয়েটার ও গিরিশ-পর্ব, ৩) শিশির-পর্ব, ৪) বাংলা থিয়েটারে রাজনীতি।

শৌখিন মঞ্চের কাল

আমরা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগগুলি দেখি, সেগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রত্যেক পণ্ডিত ঐতিহাসিক তাঁদের আলোচনা শুরু করেছেন এই বলে যে তাঁদের ছিল বাংলা থিয়েটারের প্রতি এক আশৈশব[৩] ভালোবাসা। কিন্তু একমাত্র প্রভু গুহঠাকুরতা ছাড়া[৪] আর কারোর আলোচনায় লিখিত নাটক ও অভিনীত নাটকের তারতম্য উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। প্রত্যেকেই যেন থিয়েটার বিষয়টিকে দেখছেন নব্য বাঙালির 'ইন্টেলিজেনশিয়া' (Intellengentia) বা বৌদ্ধিক স্তর থেকে। ফলে তাঁরা নাট্যকলার আদি ও উৎপত্তি বিষয়ে কথা বলেছেন কিন্তু চৈতন্যদেবের বাইরে তার আর কোনো ধারাবাহিকতা নির্দেশ করেননি। প্রসঙ্গত তাঁরা যাত্রার কথা বললেও প্রত্যেকেই নব প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহরে ব্রিটিশ কলোনি গড়ে ওঠার পর ইংরেজি রঙ্গালয়গুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক প্রভু গুহঠাকুরতা, সুশীলকুমার মুখার্জী, মন্মথমোহন বসু সকলেই তাই করেছেন। এ যেন আমাদের শিক্ষা ও সমাজধারার প্রায় সমান্তরাল শাখার মতো চলেছে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাস বলে, ক্রমে ইংরেজ সিভিলিয়ান ছাত্রদের পাশাপাশি যখন দেশীয় ছাত্ররাও ভর্তি হতে থাকেন, তখন আরবি-ফারসি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কমতে শুরু করে এবং ইংরেজি ক্লাসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে যে বাংলা বইপত্র অনুদিত ও রচিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাও তো সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনকে ছাপিয়ে বিদ্যাসাগর

(১৮২০-৯১) ও তৎপরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথ প্রস্তুত করছিল। কিন্তু এই বিলিতি রঙ্গালয়গুলি কি বাংলা থিয়েটারের পথ সুগম করেছে কোনোভাবে? এর উত্তরে বলা যায়, নব্য শিক্ষিত বাঙালি ধনী বাবুরা উৎসাহিত হলেন থিয়েটার বিষয়টি সম্পর্কে, এবং সেইসঙ্গে আমাদের নিজস্ব রীতি যাত্রাকে[৫] পরিহার করতে। এও আমরা দেখতে পাই, এইসব রঙ্গালয়ে মহিলা চরিত্রে অভিনেত্রীরাই অবতীর্ণ হয়েছেন, পুরুষেরা কেউ রঙ মেখে শেক্সপিয়ারের নাটকের নায়িকা সাজেননি। এই বিদেশি থিয়েটারের প্রভাবে ১৮৩১- এর হিন্দু থিয়েটারে 'জুলিয়াস সিজার' কেবল নয় ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' বাংলায় নয় ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে অভিনয় করা হয়েছে, অনুবাদ করেছেন সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর শ্রীরামপুর মিশনের পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদ হোরেস হেম্যান উইলসন, অভিনয় করেছেন হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ছাত্ররা। সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে ১৮৫৩ তেও, ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে আগস্টের ২ বা ৩ তারিখে অভিনীত হয় 'ওথেলো', পুনরায় অভিনীত হয় অক্টোবরে এবং পরের বছর মার্চে অভিনীত হয় 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'। হিন্দু থিয়েটারে 'জুলিয়াস সিজার'-এর অংশবিশেষ অভিনীত হয়েছিল, হতেই পারে যে তাতে কোনো নারীচরিত্র ছিল না। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে[৬] "অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক", ধরে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই এই অভিনয়ে নারীচরিত্রে এই কিশোর যুবকরাই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্গসমাজে ইংরেজি শিক্ষিতা কোনো ললনার মঞ্চে অবতরণের কোনো প্রশ্নই তখন ওঠে না। যদিও 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এর দ্বিতীয় অভিনয়ে পোর্শিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মিসেস গ্রীগ নামে এক ইংরেজ অভিনেত্রী এবং এই অভিনেতাদের অভিনয় শিক্ষকতা করেছেন যথাক্রমে একজন সাহেব এবং মেম সাহেব, নাম ক্লিঙ্গার এবং এলিস। (বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০)। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয় জনপ্রিয় হলে এবং ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমে এই থিয়েটার দর্শকের উৎসাহের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৯৫-এর ডিসেম্বরে লিয়েবেদেফের 'বেঙ্গলি থিয়েটার' সেই অর্থে বাংলা থিয়েটারকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে পৌঁছে দেওয়ার প্রথম প্রয়াস কেননা এখানে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার, দেশীয় পদ্ধতিতে মঞ্চসজ্জা ছাড়াও অভিনয়ে সারি জারি গানের দল থেকে[৭] অভিনেত্রীদের নেওয়া হয়েছিল। যেহেতু লিয়েবেদেফ ছিলেন অ-ইংরেজ, রাশিয়ান বাদ্যকার এবং ভাষাবিদ পর্যটক এবং অনিবার্যভাবে ব্রিটিশের কোপানলে পড়ে তাঁকে ভারত ছাড়তে হল, তাই আমাদের ঐতিহাসিকেরাও তাঁকে বাংলা থিয়েটারের পথিকৃৎ বলতে নারাজ। তাঁর পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ৬ অক্টোবর ১৮৩৫-এ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয়। নানা কারণেই এই অভিনয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সুবীর রায়চৌধুরী ও স্বপন মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে বাড়ির নানা স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় যে আয়োজিত হয়, তা অভিনব ছিল না, কেননা মন্মথমোহন বসু (১৮৭০-১৯৫৯)-এর সাক্ষ্যে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শান্তিপুরে ভাগিরথীর তীরে চৈতন্যদেবও বাস্তব পটভূমিতে তাঁর পালা 'দানলীলা'-র অভিনয় করেছিলেন। (বসু, ১৯৪৮, পৃ ৬৮)। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বাড়িতে কোনো বাস্তব পরিবেশ ছিল না, রীতিমতো দৃশ্যপট আঁকা হয়েছিল, যেগুলি 'সর্বাঙ্গসুন্দর' হয়নি বলে ২২শে অক্টোবরের *হিন্দু পাইয়োনিয়র* [৮] সমালোচনা করেছিল। বরং শ্রীবসুর সাক্ষ্যেই আমরা নবীন বসুর মঞ্চের এই অভিনবত্বকে 'মধ্যযুগের খ্রিস্টান যাজক'দের মঞ্চ বিন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়[৯] বলতে পারি।

আমরা যদিও বলেছি উনিশ শতকের শুরুতে নাট্যসমালোচনার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নানাদিক থেকে ২২ অক্টোবর ১৮৩৫-এর *হিন্দু পাইয়োনিয়ার*-এর প্রতিবেদনটি এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে আধুনিককালেও এরকম লেখার সন্ধান মেলে না। বলা হয় এই রঙ্গালয়ে ১) ইংরেজি ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় অভিনয় হয়ে থাকে। ২) এই রঙ্গালয়ে বাঙালী রমণীরা সর্ব্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রী লোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন। (পূর্বোক্ত)। ৩) 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় দেখতে এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন ইউরোপীয় ও অন্যান্য

নানাজাতীয় দর্শক- এর সমাগম হয়েছিল। ৪) জানা যায়, অভিনয় শুরু হয়েছিল রাত বারোটার কিছু আগে, শেষ হয় পরদিন ভোর সাড়ে ছটায়। এই রীতিই পরবর্তীকালেও অনুসৃত হতে দেখি, ব্যবসায়িক মঞ্চেও কখনো সন্ধ্যা সাতটায় কখনো রাত আটটা কিংবা নটায়[১০] অভিনয় শুরু হতে দেখা যায়। কোনো কোনো শৌখিন অভিনয় যেমন চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের কাছে মল্লিকবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)-এর উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'-র অভিনয় রাত সাড়ে দশটাতে শুরু হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয়ের আলোচনা। প্রতিবেদকের সুন্দরের ভূমিকায় যুবক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় কেন উপযুক্ত মনে হয় নি সে সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন এবং, বিদ্যার ভূমিকাভিনেত্রী রাধামণির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন আর এক অভিনেত্রী জয়দুর্গার যিনি একই সঙ্গে রানী ও হীরা মালিনী করেছেন। একজন অভিনেতা/ অভিনেত্রীর একাধিক চরিত্রে অভিনয়ের প্রবণতা আমরা ব্যবসায়িক মঞ্চেও পরবর্তীকালে দেখতে পাব। প্রতিবেদক প্রায় একটি সামাজিক আন্দোলনের আবেদন রেখেছেন যে রাধামণির মতো প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, যে বালিকা 'অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ'তাকে শিক্ষিতা করে তোলার দায়িত্ব কি দেশবাসীরা নেবেন না? পরিশেষে ধনী দেশীয় ভদ্রলোক হলেও নবীনচন্দ্র বসু যে 'নৈতিক বিপ্লব' ঘটাচ্ছেন তার উল্লেখ করে এই নাট্যশালার স্থায়িত্ব কামনা করেছেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এও উল্লেখ করেছেন *ইংলিশম্যান* পত্রিকা এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে, এই অভিনয়ে 'নৈতিকতা'র ও 'শালীনতা'র অভাব লক্ষ করেছিলেন।[১১] অবশ্য এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা ব্রিটিশের রুচির অনুসরণে নাট্যাভিনয়ের কালে একে বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠা করা, উপরন্তু তার অভিনয়ে নারীচরিত্রে মেয়েদের অভিনয় করানোর সামাজিক ঝুঁকি নেওয়া আদপেই সহজ কাজ ছিল না উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তখনও বাংলা ভাষায় সাহিত্যের জন্ম হয়নি, কবিতা-উপন্যাস, সবের আবির্ভাব

এর বেশকিছু পরের ঘটনা। নবীন বসুর পরে যে বাংলা নাটক অভিনীত হল, ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুয়ারি আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)-এর বাড়িতে বৈদ্য নন্দকুমার রায় অনুদিত 'শকুন্তলা' নাটকের, সেখানে বহুমূল্য অলঙ্কার পরে শরৎচন্দ্র ঘোষ সাজলেন শকুন্তলা। এর ১৬ বছর পর এই শরৎচন্দ্র ঘোষই একই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ অভিনেত্রী নেবার প্রয়োজনে বহুবিতর্কিত কমিটি মিটিং বসান। তাহলে ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৩-এই ৩৮ বছরের বাঙালির নাট্যচর্চায় মেয়েদের ভূমিকা নেই।

শৌখিন নাট্যচর্চার ইতিহাসে আর কোনো নাট্যাভিনয়ে লিয়েবেদেফ কিংবা নবীন বসুর উদ্যোগের মতো বিশেষ চিন্তন বা প্রস্তুতিমগ্ন নাট্যবোধের খুব একটা পরিচয় মেলে না। আমরা জোর দিয়েই বলতে চাই লিয়েবেদেফের উদ্যোগ যতই না কেন বিচ্ছিন্ন হোক, অভিনয়ে দেশি বাজনা দেশজ দৃশ্যপট এবং সর্বোপরি অভিনেত্রীদের জায়গা দিয়ে তিনি থিয়েটারের এক আধুনিক সম্ভাবনা সূচিত করেছিলেন, যা উত্তরকালে রবীন্দ্রনাট্যচর্চাও সম্পূর্ণত পারেনি। দ্বিতীয়ত, নবীন বসু তাঁর রঙ্গালয়ে যে কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, তা একেবারে হাল আমলের বাংলা থিয়েটারে এবং বিদেশে অনেককাল ধরেই অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, যাকে বলা যায়, Site Specific Theatre-তারই পূর্বসূরি। প্রসঙ্গত আমরা মনে করতে পারি, প্রসিদ্ধ নাট্যনির্দেশক পিটার ব্রুকের কথা, যিনি প্রায় আজীবন প্রসিনিয়াম মঞ্চের ঘেরাটোপের বাইরে তাঁর নিরীক্ষামূলক কাজ করতে করতে অবশেষে এইরকম এক বিশাল স্পেসে নঘণ্টা ব্যাপী[১২] 'মহাভারত' প্রযোজনা করেন। মুখ্যত একটি বড়ো জায়গা জুড়ে নানান আভিনয়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং একাজে বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ঐকতানিক গীত-বাদ্যের প্রয়োগ ঘটানো, সর্বোপরি নারীচরিত্রে অভিনেত্রী ব্যবহার- অনেকগুলি কারণেই নবীন বসু[১৩] পথিকৃৎ স্বরূপ হয়ে আছেন। অথচ তিনি ইংরেজি কোনো নাট্যশিল্পীর কোনো সাহায্য নেননি এবং যতই না কেন 'রোমিও জুলিয়েট'-এর সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর তুলনা করুন বাঙালি কৃতবিদ্য সমালোচক[১৩এ] - পালাটি বিলিতি যন্ত্রাদির ব্যবহারে দেশজ

নাট্যের অভিনয়ই ছিল। কী অভিনয়ে, কী আঙ্গিকে, কী প্রয়োগভাবনায়, কী সমাজসংলগ্নতায় -- ১৮৫৪ সালে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো বাঁক বাংলা থিয়েটারে যে ঘটেনি, তা সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদনের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায়-

১) যে-যুবকটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁহার অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরা সত্যই রাণীর মতো...অন্য অভিনেতাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। (৩০ জানুয়ারি ১৮৫৭ শকুন্তলা অভিনয় প্রসঙ্গে ১৫ ফেব্রুয়ারির '*হিন্দু পেট্রিয়ট*')

২) ...নাট্যশালার পারিপাট্য ও নাট্যদিগের নিপুণতায়... চাতুর্য্যে উপস্থিত ব্যক্তিরা মোহিত হইয়াছিলেন সময়ে সময়ে চমৎকার চমৎকার কেবল এই শব্দ করিয়াছেন। (৯ ফেব্রুয়ারি *সমাচার চন্দ্রিকা*)।

৩) নটের উক্তি গুলীন উৎকৃষ্ট হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আপন বক্তব্য বিস্মৃত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিরক্ত ও আপনি লজ্জিত হইয়াছিলেন... আমি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম; সুতরাং চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রদূত প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যবরদিগের গুণ বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না.... ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ কস্যচিৎ যথার্থবাদি দর্শকস্য। (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭য় "মহাশ্বেতা" অভিনয় প্রসঙ্গে '*এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্তাবহ*' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র)।

৪) অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভুরি ভুরি ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন... (জয়রাম বসাকের বাড়ি, কুলীনকুলসর্বস্ব-র অভিনয়, মার্চ ১৮৫৭ প্রসঙ্গে ২৫শে মার্চ, *সংবাদ প্রভাকর*)।

ক্রমশ এই ধরনের অভিনয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দর্শক সমাগমও বাড়ছিল। সঙ্গে বাড়ছিল ব্যয়বাহুল্যও। জানা যাচ্ছে, ওই বছরেরই ২৪ নভেম্বর কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী'-র অভিনয়ে টিকিট না পেয়ে অনেক 'অভিজাত' দর্শক ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে *হিন্দু পেট্রিয়ট* যা লিখেছিল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য- তাঁহার বদান্যতা ও অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ের ফলে কলিকাতায় বিশুদ্ধ আমোদের একটি চমৎকার স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল।[১৪] তখনও পর্যন্ত থিয়েটার

একটি উৎকৃষ্ট 'আমোদ' বলেই বিবেচিত হচ্ছে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার 'রত্নাবলী' অভিনয়ও তাই (৩১ জুলাই ১৮৫৮) এবং সম্ভবত ইংরেজ দর্শকদের তৎসম শব্দ প্রধান সংলাপ বোধগম্য হতে অসুবিধা থাকায় মধুসূদন (১৮২৪-৭৩)-কে পাঁচশো টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য যে রঙ্গালয়ের এই জনপ্রিয়তা বাংলা নাটক রচনাতেও জোয়ার এনেছিল নিঃসন্দেহে। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬) বিরচিত *কুলীনকুলসর্বস্ব* নাটক মুখ্যত এর প্রধান দাবিদার[১৫] কেননা ইতিহাস পরে একে 'প্রহসন' চিহ্নিত করে পাশঠ্যালা করে রাখতে পারে, কিন্তু প্রকাশ কালে একে 'নাটক' রূপেই অভিহিত করা হয়েছে। নাটককার সংস্কৃত প্রহসনের করণকৌশল নিয়েছেন বটে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এটি একটি সামাজিক সমস্যা নির্ভর মৌলিক রচনা, যা মাইকেলের মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা* নাটকের আগেই আরো অনেক সমাজ সমস্যা মূলক নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, তদুপরি রচনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে একাধিকবার এবং সফল হয়েছে। আমরা বলতে চাইব, ২৩শে এপ্রিল ১৮৮৯ সালে মেট্রোপলিটন থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত যে *বিধবা বিবাহ* নাটক অভিনয় হতে পারল, তার মূলে কৃতিত্বও এই নাটকের। ১৮৮৯-এর ১৯শে এপ্রিলে *বেঙ্গল হরকরা*-য় একটি চমৎকার প্রতিবেদনে লেখা হয়, রাত আটটায় শুরু হয়ে ভোর তিনটেয় শেষ হয় অভিনয়, প্রায় পাঁচশো দর্শক ছিলেন, মি. হলবাইন নামে এক শিল্পী দৃশ্যপট আঁকেন, এবং অভিনয় ও বিষয়ের গুণে এই দীর্ঘ নাটক শেষ হবার আগে কোনো দর্শক "স্থানত্যাগ করেন নাই"। এবং দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই নাটকে নারী-চরিত্রের অভিনয় যেন নারীদের দ্বারাই হয়।[১৬] *সংবাদ প্রভাকর*-এর ৭ মে তারিখের প্রতিবেদনে দৃশ্যবিন্যাস, অভিনয় এবং সঙ্গীতায়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়- ...বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। প্রসঙ্গত বলা দরকার, গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের যুগের আগে যে দুজন বড়ো মাপের অভিনেতাকে বাংলা

থিয়েটার পেয়েছিল, যাঁরা দুজনেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' আর *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে অভিনয় করেছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬?-১৯০৮) (বিদূষক> শর্মিষ্ঠা> ৩সেপ্টেম্বর ১৮৮৯> বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ) ছিলেন 'বিধবা বিবাহ' নাটকের অভিনয় শিক্ষক। অপরজন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) (রাণা ভীমসিংহ> কৃষ্ণকুমারী> ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭> শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি)।

বাঙালি সমাজ হুজুগে জাতি বলে বরাবরই সুপ্রসিদ্ধ। ফলে অল্পকালের মধ্যেই নাট্যাভিনয়ের প্রাদুর্ভাব বেড়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির সভাসমিতির প্রাদুর্ভাব নিয়ে মশকরা করেছিলেন। প্রায় একই সুরে মধুসূদনকে চিঠিতে লিখেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮), নাট্যশালার সঙ্গে তিনি তুলনা করেছিলেন 'ব্যাঙের ছাতা'কে। আক্ষেপও করেছিলেন এদের স্থায়িত্ব বিষয়ে। কিন্তু তিনি এর মধ্যে যে সুলক্ষণ দেখছিলেন তা হল নাট্যকলা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সঞ্চার। আমাদের বিচারে *কুলীনকুলসর্বস্ব* যেমন বাংলা নাটক রচনার সূচনা ঘটায়, তেমনি 'বিধবা বিবাহ' অভিনয়ের সাফল্য অনর্থক ব্যয়বহুল অনুবাদ বা রাজা-রাজড়ার থিয়েটার থেকে সামাজিক প্রহসন অভিনয়, যার ব্যয়বাহুল্য নেই, সেদিকে চালিত করতে থাকে এই বাবু থিয়েটারকে। যতীন্দ্রমোহন যদিও পাথুরিয়াঘাটায় অশ্লীলতাবর্জন করে 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৬৫) এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অভিনয় (১৮৮৯) করেন। ক্রমশ দেখা যায় সামাজিক নাটকের ঝোঁক বাড়ছে, যা চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যোগে 'লীলাবতী' অভিনয় অবধি (১৮৭২, ২৩ মার্চ) গড়াবে।

দ্বিতীয় কথা হল, বিলাসবহুল থিয়েটারের জন্য আমরা একদা যাত্রাকে পরিহার করেছিলাম। এইবার ব্যয়বাহুল্য সঙ্কোচন দৃশ্যপটের বালাই দূর এবং যাত্রার রুচিহীনতাকে এড়িয়ে সঙ্গীতরসিক দর্শকের পরিতৃপ্তির জন্য নাটক ও যাত্রার মাঝামাঝি এক নতুন আঙ্গিক 'গীতাভিনয়'-এর জন্ম হল। যেহেতু বাংলা থিয়েটারে কোনটি প্রকৃত নাটক কোনটি নয়, কোন নাটক অভিনয় হওয়া

উচিত, কোন নাটক অভিনয় হওয়া উচিত নয়, কোন আঙ্গিকে অভিনয় হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে আজও কোনো নির্ণায়ক নেই, সেদিন তার প্রশ্নও ছিল না। ফলে সখের যাত্রা ও গীতাভিনয়ে গুলিয়ে গেছে কখনো কখনো, নাটক নির্বাচনেও ভেবে দেখা হয় নি[১৭] কোন নাটক কোন আঙ্গিকের উপযুক্ত। সংবাদ মাধ্যমগুলি যেমন নতুন উদ্যোগকে প্রশংসা করেছে আবার যেখানে ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, সমালোচনাও করেছে। এইরকমই একটি জনপ্রিয় পালাগান ছিল, *নল দময়ন্তী* (১৮৬৫) লেখক কালিদাস সান্যাল। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'র স্মৃতিচারণায় খুব সম্ভবত এই পালার কথা মনে করেই লিখেছেন-

> ...পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মকশো করেনি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশাই দেননি পালিশ করে।[১৮]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা যেমন লেখকের প্রবণতা বা সময়ের পরিবর্তন লক্ষ করে আমরা দশক বা ধারাকে আলাদা করি, পরিতাপের বিষয় বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে তা কখনোই করা যায়নি। ফলে একধরণের থিয়েটারের সূত্রপাত মানেই আগের থিয়েটার শেষ হয়ে যাওয়া নয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা বা তৎপরবর্তীকালে ব্যবসায়িক মালিকানাধীন সাধারণ রঙ্গালয় চলাকালীন শৌখিন অভিনয় চলেছে কলকাতা ও মফঃস্বলে, গীতাভিনয় মুখ্যত ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য এবং ঐতিহ্যবাহী নাট্যের স্বাদ দেবার জন্য। গিরিশচন্দ্রই বাগবাজার অ্যামেচার ক্লাবে 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী'-র পাশাপাশি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' গীতাভিনয় করেছেন নিজের লেখা অনেকগুলি গান সংযোজন করে।

শৌখিন নাট্যচর্চার দ্বিতীয় পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, একই কালে, একই মঞ্চে একই নাটকে দুই যুগন্ধর অভিনেতার আবির্ভাব- গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী (১৮৫০-১৯০৯)।

বলা যায় বিষয়কে ছাপিয়ে এই প্রথম অভিনেতা বড়ো হয়ে দেখা দিলেন বাংলা থিয়েটারে। একই সঙ্গে এও বলা যায়, থিয়েটারে আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাই হয়ে উঠলেন শেষ কথা, তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার বিস্তারেই থিয়েটারের যা কিছু প্রতিপত্তি, অথবা সমালোচনা-নিন্দাও। গিরিশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত এই ধারাই প্রবাহিত হয়েছে, যদিও আমরা পরে আলোচনা করব, শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের আভিনয়িক দক্ষতার অনুসরণ করার পাশাপাশি তাঁর নির্দেশকের ভূমিকাকেও অপরিহার্য করে তোলেন, যিনি মূলত অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ বিস্তারের স্বার্থেই অন্যান্য উপাদানগুলির নান্দনিক সামঞ্জস্য বিধান করবেন। সন্দেহ নেই, নির্দেশকের এই ভাবনা এসেছে পশ্চিমের দেশ থেকে, কেননা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যেহেতু বিচিত্র স্বর ও তানের মধ্যে সামঞ্জস্য বা Hermony রক্ষার জন্য একজন Conductor বা সঞ্চারক থাকেন, নির্দেশকও তেমনই 'তিলোত্তমাশিল্প' নাট্যের সব কলা বিভাগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। পরবর্তী কালে গ্রুপ থিয়েটারের কর্মকাণ্ডে পৌঁছে আমরা দেখব, তেমন তেমন সঞ্চারক ক্রমশ হয়ে উঠবেন Composer ও (বাংলায় এই শব্দের প্রতিশব্দ হল 'সুরকার'), তাঁর নাট্যভাবনা অনুযায়ী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং শিশিরকুমারের থিয়েটারে সঞ্চারককে ক্রমশ সুরকার হয়ে উঠতে দেখা গেছে বলেই উত্তরযুগে তাঁদের প্রভাব রয়ে গেছে অমোঘ। স্বভাবতই শৌখিন নাট্যের দ্বিতীয় পর্বে থিয়েটারের এই সাবালকত্ব প্রত্যাশিত ছিল না। বরং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বড়ো চাতুরি, পূর্বোক্ত 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র মতোই এই পর্বের শুরুতেই লক্ষ করা যায়। আমাদের ইতিহাস বাংলা মৌলিক নাটকরচনার যাবতীয় কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিতে চাইলেও থিয়েটারের ইতিহাস বলে, শৌখিন নাট্যচর্চার দ্বিতীয় পর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক এবং অদ্বিতীয় নাটককার অবশ্য ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), যাঁর 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' একাদিক্রমে এবং অব্যবহিত রূপে বছরের পর বছর শহর কলকাতার ও মফঃস্বলের শৌখিন নাটমঞ্চে এবং ন্যাশনাল-উত্তর ব্যবসায়িক মঞ্চে অভিনীত হয়ে

গেছে। ১৮৭২এর ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হবার ঘটনা ছাড়াও 'নীলদর্পণ' নাটকের মুখ্য কৃতিত্ব ব্যবসায়িক মঞ্চে সুদীর্ঘকাল অভিনীত হওয়া। তাঁর বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চুঁচুড়ায় ১৮৭২-এর ২৩ মার্চ গুডফ্রাইডের দিনে *লীলাবতী* অভিনয়ের জন্য নাট্য পাঠটির ব্যাপক সম্পাদনা করেন, এবং নিজেরা কিছু গান লেখেন। বন্ধু নাটককারের অনুমতি ব্যতিরেকে এই সম্পাদনা আমাদের কিছুটা বিমর্ষ করে তোলে, এবং দেখা যায়, দুই কাগজে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া, ৫ এপ্রিল ১৮৭২-এর *এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্তাবহ*-এ নিন্দা, আর ৪ এপ্রিলের *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় প্রশংসা (বঙ্কিমচন্দ্র বলেই কি?)। পাশাপাশি আসরে নামছেন নাটককার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) তাঁর 'রামাভিষেক' নাটক নিয়ে, ঢাকা, তমলুক, গৌহাটিতে অভিনয়ের সুবাদে। এরপর তাঁকে দেখা যাবে অন্য মূর্তিতে, গীতাভিনয়ের প্রাঙ্গণে।

আগেই বলা হয়েছে, ইতোপূর্বেই ১৮৬৮তে (প্রথম অভিনয়ের তারিখ বিতর্কিত) বাগবাজার অ্যামেচার ক্লাবের 'সধবার একাদশী' যথাক্রমে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর-এই ত্রয়ীকে একত্রিত করল। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'নিমচাঁদ'-এর চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় আজ পর্যন্ত একটি 'মিথ' হয়ে আছে, তাকে অতিক্রমণের আর কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। গিরিশচন্দ্র সশ্রদ্ধ মনে স্বীকার করেছেন, অর্ধেন্দুশেখরের আগ্রহেই এরপর তিনি 'লীলাবতী' অভিনয়ে[১৯] যুক্ত হন। এই নাটকে মূল রচনার কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হয় নি এবং এই নাটকের অভিনয় এত জনপ্রিয় হয় যে এখান থেকেই দলের নাম বদলে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ হয়, এখান থেকেই 'দেশীয় রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার দাবি উঠতে থাকে, *এডুকেশন গেজেট*, *মধ্যস্থ* প্রমুখ পত্রিকা ভূয়সী প্রশংসা, কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎকর নিন্দাসহ প্রকাশ করে। গিরিশচন্দ্র নিজের অভিনীত 'ললিতমোহন' চরিত্র প্রসঙ্গে কিছু না বলে অর্ধেন্দুশেখরের প্রয়াণের পর পূর্বোক্ত বক্তৃতায় দেখান, 'সধবার একাদশী'-তে 'জীবনচন্দ্র' ছিল অর্ধেন্দুর 'সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয়', 'লীলাবতী'-র 'হরবিলাস'

‘একেবারে চমৎকৃত’ করে দেয়। এক নট আরেক সমসাময়িক নটের এইরকম মুক্তমনা প্রশস্তি পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটারেও বোধকরি বিশেষ আর কখনো দেখা যায় নি।

ন্যাশনাল থিয়েটার ও গিরিশ-পর্ব

‘লীলাবতী’-র পর ‘নীলদর্পণ’ মহলা শুরু হল। প্রথম দাবি ছিল দুটি। ১) দেশে অভিনয় কার্যকে নিয়মিত করা। ২) শৌখিনতাকে বিদায় দিয়ে পেশাদারিত্ব আনা। সেই সুবাদেই পারিশ্রমিক ও টিকিটের মূল্য রাখার কথা ওঠে। রাখাও হয়েছিল দাম, প্রথম শ্রেণি ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণি ।।০ আনা। ফলে এবার এসে গেল কমিটি ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসের কাছাকাছি ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামকরণ ও...।[২০] সমস্ত পত্রপত্রিকাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় এই উদ্যোগকে সার্থক[২১] করতে। গিরিশচন্দ্র শুধু বিরত থাকেননি, সমূলে বিরোধিতা করেছেন। ছড়া লিখেছেন, *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় চিঠি দিয়েছেন, অথচ নিজে পরে ডিরেকটর হয়েছেন, পরিচয় গোপন রেখে ‘কৃষ্ণকুমারী’-তে অভিনয় করেছেন। বস্তুত ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে গিরিশচন্দ্রকে তেমন সক্রিয় দেখাও যায় না, জীবনী পাঠে জানা যায় সেই সময়ে তিনি পারিবারিক বিপর্যয়, চাকরি ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ণ সময়ের নাট্যজীবনে শুরুর দিকে তাঁর একটি দ্বিধা ছিল। তাছাড়া থিয়েটারের একেবারে অন্দরের মানুষ হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন ন্যাশানালিজমের ধুয়ো তুলে রাজরোষের শিকার হওয়া কতিপয় মানুষের পছন্দের থিয়েটারের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না, তাছাড়া পেশাদার হয়ে ওঠার যোগ্যতাও অর্জিত হয় নি। পরে যখন ‘ন্যাশনাল’ এই নামটি একটি ব্র্যান্ড হয়ে উঠল, তখন তিনি বুঝলেন, মানুষের মনে প্রকৃত জাতীয় ভাব গড়ে তুলে সর্বসাধারণের মধ্যে থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা করা ঢের জরুরি কাজ। উপরন্তু অপেশাদার অভিনয়ে তিনিও নারীচরিত্রে পুরুষ-অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তি মালিকানাধীন থিয়েটারে তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে শ্রেষ্ঠতম নাট্যশিক্ষক, পতিতা-

অভিনেত্রীদের প্রধান আশ্রয়স্থল। একে অভিনেত্রীদের প্রাধান্য তায় তাঁর মদ্যপান ইত্যাদি কারণে তাঁর নাট্যাভিনয় নিয়ে শিষ্ট সমাজে একটি প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁর নাট্যরূপে জনপ্রিয় হয়, সেই বঙ্কিম-অনুগামী *সাধারণী* পত্রিকা তাঁর থিয়েটারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সমালোচনা[২২] লেখে। কিন্তু অমিত যাঁর প্রতিভা, তাঁকে দাবিয়ে রাখা দুষ্কর। সেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'-র নাট্যরূপে মনোরমার ভূমিকা নির্বাহ করতে বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪২) আসেন-নামেন গিরিশের 'মেঘনাদবধ' নাট্যরূপে প্রমীলার অভিনয়ে, যখন ন্যাশনাল থিয়েটার কমিটি ছাড়িয়ে প্রতাপচাঁদ জহুরির মালিকানায় আসে, অনেক দ্বিধা ছেড়ে দেড়শো টাকা মাইনের পার্কার অ্যান্ড কোং-এর চাকরি ছেড়ে একশো টাকা মাইনের ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে প্রতাপচাঁদের অধীনে গিরিশ অভিনয় করেন 'মেঘনাদবধ'-এ, তখন ২০ জানুয়ারি ১৮৮১র *The Statesman* লেখে-

> By his renderings of the double charaters Baboo G.C. Ghosh shows great power as an actor. Miss Binodini as Pramila and in other minor characters proved not unworthy of her pseudonym of the "flower of the native stage.[২৩]

১৮৮১ থেকে ১৯১২ অবিচ্ছিন্ন এই একতিরিশ বছরে গিরিশ প্রতিভার বিচ্ছুরণ-বিস্তার, তার উত্থান-পতন বলা বাহুল্য এই আলোচনার প্রতিপাদ্য নয়। আমরা বলতে চাইছি যে প্রথম যুগের তুলনায় এই যুগে নাট্য-সাংবাদিকতার চরিত্র বদলে গেল। এই সময়ে বিস্ময়করভাবে বাংলা সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে নাট্যের খবরাখবর যে নানা পত্রে নেই তা নয়। কিন্তু যথার্থ নাট্য সমালোচনা ছিল কিনা তা সন্দেহাতীত নয়। যেমন বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৭-এর ১৬ মে অভিনীত 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটক ও 'আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ' প্রহসনের অভিনয় নিয়ে *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় প্রকাশিত ১৮ই মে-র প্রতিবেদন জুড়ে উক্ত প্রহসন অভিনয়ের বিরূপতার বৃত্তান্ত, মূল নাট্যের প্রসঙ্গই নেই [২৩এ]। তেমনই খবর ১ নভেম্বর ১৮৮৮-র *সুলভ সমাচার, কুশদহ* ও *বীণা*

মূলত থিয়েটারের খবরাখবরই ছেপেছে।[২৪] যা কিছু আলোচনা সবই *Bengalee*, *The Statesman*, *Indian Daily News* ইত্যাদিতে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) নিজ উদ্যোগে একাধিক পত্রিকা বার করেন, *সৌরভ* (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩০২), *রঙ্গালয়* (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯০১), *নাট্যমন্দির* (শ্রাবণ ১৩১৭) ইত্যাদি এবং সেইখানে থিয়েটারের ভিতরের মানুষদের লেখবার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র সম্পাদনা করেছেন *সৌরভ*, লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি এইসব পত্রে। আমরা ইতোপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গিরিশচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণগ্রন্থগুলির পরিচয় দিয়েছি, তন্মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৮-১৯৫৭) তাঁর *গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দেখান যে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর ছাব্বিশ বছরের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের অবনতি ঘটেছে। এই অবনমন তাঁর মৃত্যুর আগেই শুরু হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)-র একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন যেটি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর আগের বছর লেখা হয়েছিল এবং তাতেও এই অবনতির[২৫] কথা ছিল। সম্প্রতি গিরিশচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পুনরায় গিরিশ-চর্চার প্রমাণ মেলে, এবং বর্তমান গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে শিষ্ট সমাজে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যাখ্যানের কারণ-অনুসন্ধান এবং গিরিশচন্দ্রের গদ্যরচনা থেকে তাঁর নাট্যমানসের[২৬] খবরাখবর মেলে।

শিশির পর্ব

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে অভিনয়ের চাতুর্য ও গভীরতায় শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের মানসশিষ্য। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য প্রথমাবধি তিনি পেয়েছেন শিষ্ট শিক্ষিত সমাজের সমর্থন ও পুষ্টি। রবীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে আমল দিতে চাননি, তাঁকে কেবলমাত্র বঙ্গদেশে থিয়েটার নামক ক্ষেত্রটির

প্রতিষ্ঠাতার বেশি মর্যাদা দেন নি তিনি, কিন্তু নানাভাবে শিশিরকুমারকে ধাতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথম থেকেই শিশিরকুমার পেয়েছিলেন সমালোচকদের আনুকুল্য। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) যিনি পরবর্তী সময়ে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার অমূল্য মূল্যায়নের জন্য দীর্ঘকাল *নাচঘর* পত্রিকার সম্পাদনা করবেন সহযোগী সম্পাদক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রথম প্রকাশ ৯মে ১৯২৪ (২৬ বৈশাখ ১৩৩১), এবং *বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার* (অক্টোবর ১৯৮৬ নবায়িত সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি) নামক একটি মূল্যবান সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করবেন, সংবাদপত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে প্রথম সমালোচনাও তিনিই করেছিলেন *হিন্দুস্থান* পত্রিকার ২৫ জুন ১৯২৫[২৭] তারিখে। *নাচঘর* ছাড়াও *সচিত্র শিশির, শনিবারের চিঠিও* ছিল শিশির-অনুরাগী। অবশ্য বিরুদ্ধ সমালোচনাও অনেক সহ্য করতে হয়েছে শিশিরকুমারকে, এই পরিসরে আমরা কেবল সেই কথাটুকু মনে রাখছি, বিস্তারিত আলোচনা অন্য পরিসরে করা যাবে।[২৭এ]

১৯২৩ সালটি ছিল শিশিরকুমারের নাট্যজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বছর রবীন্দ্রনাথ আগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের প্রথমে নিউ এম্পায়ারে চার রাত্রি অভিনয় করলেন 'বিসর্জন' নাটক, বাষট্টি বছর বয়সে জয়সিংহের ভূমিকায়। ওই বছরেই আর্ট থিয়েটার, যারা ছিলেন বস্তুত শিশিরকুমারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, যারা কৌশলে অধিকার করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের অভিনয়সত্ত্ব, তারা বাণিজ্যিক ভাবে সফলতা পেলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৮) রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটকে। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাট্যের অভিনয়ে দর্শক ছিলেন অমৃতলাল বসু, অহীন্দ্র চৌধুরি এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী তিনজনই। এইসবের অভিঘাতে ঘটল বাংলা রঙ্গালয়ে যুগান্তকারী ঘটনা- ১৯২৩-এ বড়দিনে শিশিরকুমারের নিজ সম্প্রদায় গড়ে ইডেন গার্ডেনে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয়, এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ৬ আগস্ট ১৯২৪ (২১ শ্রাবণ ১৩৩১) মনোমোহন নাট্যমন্দিরে নামল যোগেশচন্দ্র চৌধুরি (১২৯৩-১৩৪৮) রচিত 'সীতা' নাটক। উদ্বোধন

করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), বিজ্ঞাপন বেরোল ৫ আগস্ট ১৯২৪ তারিখের *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য়। এই প্রথম নাট্যক্ষেত্রে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র আগমন ঘটল।

'সীতা'-র পর অবশ্য শিশিরকুমারকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে অনেক। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক তিনি ব্যাপক সম্পাদনা করলেন, গিরিশ যুগের নায়িকা তারাসুন্দরীকে (১৮৭৮?-১৯৪৮) নিলেন জনা চরিত্রে। কিন্তু *নাচঘর* শিশিরকুমারের প্রবীর চরিত্রের প্রশংসা করলেও *শিশির* পত্রিকা, Servant প্রমুখ বেশ সমালোচনা করেছে।

স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বার করেছিলেন *রূপ ও রঙ্গ* পত্রিকা। এটি মূলত চলচ্চিত্রের খবরাখবরের জন্য, কিন্তু নাটক বিষয়েও লেখা ছাপা হত। কোনো কোনো সংখ্যায় এদের শিশিরকুমার বিরোধিতা করতে দেখা গেছে কিন্তু তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু *বাঙলা* ছিল ঘোরতর শিশির-সমালোচক, *নবশক্তি* শিশিরকুমারের পক্ষে এবং *বাঙলা* শিশিরকুমারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক নিয়ে ব্যর্থ আমেরিকা ভ্রমণে (১৯৩০)-এর পর ১৯৩১ জুড়ে তীব্র চাপান-উতোর করেছে। আর এর মূলে ছিল শিবরাম চক্রবর্তীর করা 'ষোড়শী' নাট্যরূপ[২৮] হরণ।

অনেকে দেখিয়েছেন শিশিরকুমার আক্ষরিক অর্থে এক ট্র্যাজেডি নায়ক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র এবং তিনি বারবার মঞ্চ হারিয়েছেন ঠিকই কিন্তু গিরিশ ছিলেন খাঁটি নোটো ফলে নানা বিচ্যুতি বিভ্রান্তির মধ্যেও তিনি মঞ্চ বিচ্যুত হননি আমৃত্যু। কিন্তু শিশিরকুমার ছিলেন নবযুগের প্রণেতা, বাংলার প্রথম সার্থক পরিচালক কিন্তু একই সঙ্গে যেমন ম্যাডানে যোগ দিয়ে সেখানকার আটপৌরে নটনটীদের ইংরেজিতে বকুনি দিয়ে সচকিত করেছিলেন, তেমনই আজীবন এক ভিক্টোরীয় উত্তরাধিকারের বাহক। শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই উত্তরকালে সত্যজিৎ রায়ের নানা ছবিতে অভিনয় করেছেন, সবিস্তারে আলোচনা করে দেখানো সম্ভব, তাঁদের অভিনয়শৈলীতে নাট্যচার্য প্রকটিত ভিক্টোরীয় অভিনয়রীতির ছাপ আছে। [২৮এ]

সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছেও বারবার ভাগ্য তাঁকে ছলনা করেছে, ম্যাডানের পর 'নাট্যমন্দির-নাট্যনিকেতন', 'নবনাট্যনিকেতন', 'শ্রীরঙ্গম', এবং শেষ দশ বছর সম্পূর্ণ মঞ্চহীন জীবন কেটেছে তাঁর। সর্বোপরি, গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে রাজনীতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও উত্তরকালে ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয় জীবনের স্পন্দন খুঁজেছিলেন, বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা চেয়েছিলেন ঠিকই অথচ তাঁর সময়ে ঘটে যাওয়া দুদুটো বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা তাঁর মতো বিদগ্ধজনের নাট্যচিন্তনে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি, এও তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। তাঁর সমসাময়িক নট অহীন্দ্র চৌধুরী নিজে দেখিয়েছেন, ১৯৪২-এর পর পেশাদার রঙ্গালয়ে যুদ্ধের বাজারে একশ্রেণির বড়োলোকেদের টাকা খরচ করার জায়গা হয়ে উঠেছিল এবং নাটকগুলি শিল্পগত মান বা নৈতিক দায়িত্ব পালন ছাড়াই অভিনীত হতে থেকেছে। এই অবস্থা, একজন ওই মঞ্চের মানুষ হয়ে তিনি বলেছেন, চলেছে ১৯৫২[২৯] পর্যন্ত।

বাংলা থিয়েটারে রাজনীতিঃ গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজে সম্ভব হয়েছিল, কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমস্যাটা প্রথমেই বুঝে উঠতে পারেনি, যোগ দিতে পারেনি এই বিদ্রোহে। কিন্তু দুবছর পর নীল বিদ্রোহ ঘনীভূত হলে তারা দেরি করেনি, রীতিমতো সংবাদ-সাময়িক পত্রে রিপোর্ট করে প্রতিবেদন বার করে, পুস্তিকা লিখে আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়েছে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১) *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* -এ একের পর এক লেখা ছেপেছেন। সেই সঙ্গে *বাপরে বাপ, নীলের কি অত্যাচার* ইত্যাদি পুস্তিকার কথাও মনে আসে। এই ব্যাখ্যার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার, ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহ সফল হবার একটা মূল কারণ ছিল, জমিদার ও কৃষক মায় ভাগচাষীরাও সমস্বার্থে লড়েছিল নীলকরদের দাদন ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের আইনী প্রহসনের বিরুদ্ধে। সরকার ওই বছরেই 'ইন্ডিগো কমিশন'

বসিয়েছিল, এবং গ্রান্ট প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই শুধু যে এদেশে নীলচাষ রদ হয়েছিল তা নয়, ইতোমধ্যে লন্ডনে 'ওয়ড' নামক নীলের বিকল্প বস্তুটির উদ্গম হয়, কৃত্রিম পদ্ধতিতে নীল উৎপন্ন হয়ে যাওয়ায় নীলচাষের আর প্রয়োজন রইল না। কিন্তু সে যাই হোক, 'কেনচিৎ পথিকেন' ছদ্মনামে সরকারি ডাকবিভাগের কর্মচারি দীনবন্ধু মিত্র যে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখলেন (১৮৬০) তা এতদিনের ছোট ছোট সমস্যামূলক নাটক থেকে বাংলা নাটককে একটি বড়ো রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে এল। সেই নাটক নিয়ে বারো বছর পর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর দ্বারোদ্ঘাটন হল। সুতরাং আগের অধ্যায়ে আমরা বিষয়টিকে কেবল নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা দেখা যায় কি? যায় না। তাই আমাদের সন্দেহ করতেই হবে সাহেবদের কোম্পানিতে চাকরিরত গিরিশচন্দ্র শুধুই টিকিট বিক্রি করে পেশাদার হবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় নি বলে এই নাট্যাভিনয় থেকে চলে নাও গিয়ে থাকতে পারেন। জীবনীকার গিরিশচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করে বলছেন-

> ন্যাসানাল থিয়েটার নাম শুনিয়া অনেকেই মনে করিবেন এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল-ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সাজ-সরঞ্জামে 'ন্যাসানাল থিয়েটার' করিতেছে ইহা বড়োই বিসদৃশ হইবে।[৩০]

জীবনীকার এও বলছেন, টিকিট বিক্রিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, আপত্তি ক্ষুদ্র সাজ-সরঞ্জামে। যিনি থিয়েটারে অনর্থক বাবুয়ানি পরিত্যাগ করে তার অভিনয়কে বাস্তবসম্মত করেছেন, কেমন করে মনস্তাত্ত্বিক অভিনয় করতে হয় তা শিখিয়েছেন তিনি ন্যাশনাল নামক ঢক্কানিনাদ চান নি, এটা হতেই পারে-কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের প্রশ্নটিও থেকে যায়, কেননা তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, বলেছেন-

> শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার জন্য দেশের তরলমতি ছেলেরা জেলে যাবে, আর নেতারা বক্তৃতা ক'রে হুজুগে হাততালি পাবে আর যশের মুকুট মাথায় পরবে! - এটা কি স্বদেশপ্রেম? [৩১]

আনুমানিক এই উক্তির কাল ১৯০৬, যার এক বছর পর তিনি *ছত্রপতি শিবাজী* নাটক লিখবেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি এসেছে আরো পরে, ১৯১৪য় *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে। কিন্তু প্রথমদিকে তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষতা করে গান লিখেছেন। ততদিনে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তীব্র এক হিন্দুত্ববাদী মন তৈরি হতে দেখি[৩২]। অবশ্য তিনি প্রকৃত দেশভক্তি থেকে বেশ কিছু নাটক লিখেছিলেন, যে দেশপ্রেম স্বদেশি যুগের দেশপ্রেমের তুলনায় অনেক ব্যাপ্ত। যে সময় নিয়ে আমাদের মুখ্য আলোচনা, সেই সময়েও তিনি রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলেন এই অনুমান অমূলক নয়। কিন্তু তিনি সরে থাকলেও বাংলা থিয়েটার রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেনি। অবশ্য আধুনিককালেও রাজনীতি বা অনুরূপ কোনো বিতর্কিত বিষয়কে মঞ্চায়িত করে দর্শকানুকূল্য লাভের যে চেষ্টা দেখা যায়, 'নীলদর্পণ' অভিনয় তার থেকে কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। ততদিনে 'নীলদর্পণ' নিয়ে যা সমস্যা হবার হয়ে গেছে। প্রথম রজনীতে আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল, দুশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল, আগেই বলা হয়েছে টিকিটের মূল্য ছিল এক টাকা, আর আট আনা। আনুমানিক শ-তিনেক দর্শক হয়ে থাকবে, *এডুকেশন গেজেট* -এর সমালোচক থিয়েটার কতটা বোঝেন না বোঝেন বোঝা যায় নি, কিন্তু তাঁর রিপোর্টিং থেকে জানা যায়, অভিনয়ের আগে এক নট (অমৃতলাল বসু) আগে জাতীয় নাট্যালয়ের উদ্দেশ্য ও মর্ম ব্যক্ত করেন। এখানে বলা হয়, কোনো রাজনৈতিক কারণে 'নীলদর্পণ' বাছা হয়নি, এই নাটকে পল্লিগ্রামের বিশ্বস্ত চিত্র আঁকা হয়েছে বলে এই নাটক বাছা হয়েছে। এরপর সমালোচনা অভিনয় সম্পর্কে 'যথাযোগ্য', 'উপযুক্ত', 'মন্দ নহে', 'আদ্যোপান্ত দোষশূন্য', 'স্বভাবের অনুরূপ' ইত্যাদি। অপছন্দ হয়েছে একতান বাদ্য, চুনোগলির ফিরিঙ্গিদের দিয়ে বাজানো। দৃশ্যগুলি নাকি 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' উপযুক্ত হয় নাই। পরিশেষে, নাট্যালয়ে জাতীয় রীতি নীতি রক্ষায় যত্নশীল হতে বলা হয়েছে।[৩৩]

মজার বিষয় হল, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পরের সপ্তাহে ১৪ ডিসেম্বর হল 'জামাই বারিক' যে অভিনয়ে সম্ভবত গিরিশচন্দ্র ছিলেন না, কিন্তু এই অভিনয়টি আগের চেয়েও উৎকৃষ্ট হয় এবং আড়াইশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়।

রাজনীতি প্রবেশ করল 'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয়ে। যে *ইংলিশম্যান* ২০ নভেম্বর ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বার করেছিল, তারাই আবার ঠিক এক মাস পরে সম্পাদকীয়তে লিখল-

> Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libelous parts been excised.[৩৪]

উত্তরে ২৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানান, আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়ে করা হচ্ছে এবং গ্রামবাংলার জীবনচিত্র দেখানোই তাদের উদ্দেশ্য, ইংরেজদের হেয় করা নয়। ২১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় অভিনয়ে হাউসফুল হয়ে গেল, বহু মানুষ টিকিট না পেয়ে ফিরে গেলেন, থিয়েটার হলে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের আগমন হল এবং টিকিট বিক্রি একলাফে বেড়ে হল সাড়ে চারশো টাকা। এরই প্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্রের বেনামে *ইংলিশম্যানে* চিঠি দেওয়া এবং ছড়া লেখা। অবশ্য রাজনীতির প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে গিরিশচন্দ্রের আশঙ্কা সত্য বলেই পরে প্রমাণিত হয়, যেহেতু 'জাতীয়' এই নামধারণ করেছিল এই মঞ্চ তাই সঙ্গীত ভালো না হলে কিংবা 'পটক্ষেপণ পটোত্তোলন' ঠিক না হলে গানের কথা বোঝা না গেলে এবং অভিনয় মনঃপুত না হলে পত্রপত্রিকা কথা শুনিয়েছে বিস্তর।[৩৫]

গিরিশচন্দ্র এড়িয়ে গেলেন কিন্তু বঙ্গরঙ্গমঞ্চ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারল না। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ব) পরপর অভিনয় করলেন 'শরৎ-সরোজিনী' (২জানুয়ারি ১৮৭৫) যাতে দেখানো হল, এক নব্য যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় গোরা পল্টনকে মারছে। ওই বছরের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে ওই মঞ্চেই হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক, যেখানে জেলবন্দীরা ম্যজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেলকে মঞ্চে তরবারি দিয়ে হত্যা করে। আগেই এই নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে ১৪ আগস্ট অভিনীত[৩৬] হয়েছিল। সেইসঙ্গে লন্ডন থেকে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে হাইকোর্টের উকিল গজদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিবারের রমণীদের দিয়ে যুবরাজকে আপ্যায়ন জানানোয় তার প্রতিবাদে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার)[৩৬এ] এবং তার আগেই একটি বিতর্কিত মামলা নিয়ে ২২ মে হয়েছে বেঙ্গলে 'গাইকোয়াড়' নাটক, এবং ওই বছরেই প্রকাশ পায় দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *চা-কর দর্পণ* নাটক। (পৌষ ১২৮১) ১৮৭৫ সালের মাঝামাঝি লর্ড নর্থব্রুক একটি পত্রিকায় 'চা-কর দর্পণ' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ পড়েন। তাঁর থেকে অবহিত হয়ে হবহাউস জানান, Government should have the power of suppressing so stimulant a thing as the public drama.[৩৭] প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী অকালপ্রয়াতা কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২-৭৭) *বহুরূপী* পত্রিকার এক নিবন্ধে দেখান যে, ১৮৭৬এর ২১ মার্চ তারিখে অ্যাসেম্বলি হাউসের এক সভায় মি হবহাউস উত্থাপিত এক বক্তৃতা এবং লন্ডনের ভাইসরয় সহ চোদ্দজনের সভায় একটি বিল পেশ করেন। উক্ত বিলের ভিত্তিতে সভাস্থ ন'জন স্বাক্ষরিত (যার মধ্যে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর নামে এক ভারতীয় বাঙালিও ছিলেন) Dramatic Performances Bill নিয়ে আলোচনা চলে। অতঃপর Government General of India কর্তৃক পাশ করা চারপাতার Act XIX of 1876 বিলটি[৩৮] লাগু হয়। বাকিটা বহুশ্রুত ঘটনা, ভুবনমোহন নিয়োগী, উপেন দাস, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, (যার উল্লেখ উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩)-এর 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭২) নাটকে

আছে) এবং প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। উপেন্দ্রনাথ এরপর বিলেত চলে যান, অমৃতলাল কিছুদিনের জন্য কাশীধামে চলে যান, ভুবনমোহন থিয়েটার ত্যাগ করেন। পড়ে থাকেন অভিনেত্রী গোলাপসুন্দরী, উপেন দাসের নাটকের সুবাদে যাঁর নাম হয়েছিল সুকুমারী এবং উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ভদ্রঘরের সম্ভ্রান্ত যুবক অভিনেতা গোষ্টবিহারী দত্তের সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল।

এতসব ঘটনার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কোনো যোগ নেই। জীবনীকার লিখছেন,[৩৯] এই সময়ে তাঁহাকে সমস্ত দিন অফিসে কার্য্য করিতে হইত, তাহার উপর পারিবারিক শোক-তাপ ও অশান্তিতে দীর্ঘকাল তিনি থিয়েটারের সংস্রবই রাখেন নাই।

ফলত, বলা যেতে পারে ১৮৭৬-এর পর বঙ্গরঙ্গালয় গিরিশচন্দ্রর এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের কিছু ঐতিহাসিক নাটকের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে ১৯৪৪-এর 'নবান্ন' নাটক পর্যন্ত। মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)-এর 'কারাগার' (১৯৩০)-এর মতো কোনো কোনো নাটক রাজরোষে পড়ে নিষিদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র চেষ্টা করছিলেন ভারতীয় রাজনীতি যে ধারায় চলছিল, তা থেকে দূরে থেকে বাংলা থিয়েটারে এক দেশজ জাতীয় ভাব আমদানি করতে। তাঁর নিজের অভিনয়ে, অভিনয়ের শিক্ষায় যে দেশজতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল, নাট্যভাবনায় তা অনবদ্য হলেও তাঁর হিন্দুত্ববাদ তাঁকে সমালোচনার্হ রেখে গেছে। পক্ষান্তরে, শিশিরকুমার জাতীয় কংগ্রেসের কাছাকাছি থেকেও ছাড়তে পারেন নি তাঁর ভিক্টোরীয় গড়ন, ফলে তিনি আটপৌরে গিরিশচন্দ্রের পথে নয়, রাবীন্দ্রিক স্তরে খুঁজতে চেয়েছিলেন 'জাতীয় নাট্য' [৩৯এ]। দুজনের কেউই কি পরিবর্তমান সময়কে বুঝতে চেয়েছিলেন? গিরিশচন্দ্রের ক্ষোভ তো কেবল বাঙালি দর্শক সমাজ সম্পর্কে ছিল না, ক্ষোভ ছিল নাট্য-সমালোচনা নিয়েও। আসলে সবক্ষেত্রে যে পেশাদারিত্ব ছিল গিরিশচন্দ্রের অভীষ্ট, তার অভাব দেখেছেন সর্বত্র-

> পুলিশের নির্দেশমতো নাটক কেন করতে হবে, কেন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের' কোনো প্রতিবাদ নেই, এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি, বলেছেন এই দেশে কোনো প্রকৃত সমালোচক জন্মায় নি।[৪০]

গিরিশ-যুগের সঙ্গে শিশির-যুগের তফাৎ দেখানো এই আলোচনার অভীষ্ট নয়। তবু এটুকু বলতেই হয় উত্তরকাল গিরিশকে কেবল মহান নটের সম্মান জানিয়েছে, আর শিশিরকুমারকে দিয়েছে 'প্রোডিউসার'-এর মর্যাদা। রাজনীতিগতভাবে গিরিশের হিন্দুয়ানির সপক্ষতা আমাদের শিষ্ট শিক্ষিত মার্ক্সবাদী চেতনায় আঘাত হেনেছে বলে সমালোচনাকালে আমরা তাঁর লোকচরিত্র অভিজ্ঞানকেও মূল্য দিতে চাই নি, এটা জেনেও যে এই অভিজ্ঞতার স্পষ্টতই অভাব ছিল শিশিরকুমারের। তা না হলে পরিবর্তমান কালকে তিনি বুঝতে পারতেন। অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের পর বাংলা পেশাদার রঙ্গালয় সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, শিশিরকুমারকে দেখে হয়তো তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু পেশাদারিত্ব এবং সফল প্রয়োগকর্তা-উভয় দিক থেকেই তাঁর বিচ্যুতি ঘটায় অহীন্দ্র চৌধুরীর পূর্বোক্ত মতামতেই আমাদের আবার ফিরে যেতে হয়।

আই পি টি এ ও নবান্ন

বাংলা থিয়েটারের নতুন ধারার সূত্রপাত। কিন্তু মূলত অপেশাদার এই নাট্যচর্চা থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম বলে এই প্রসঙ্গকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের মুখপাত্র হিসাবে আলোচনা করব।

উৎস ও টীকা

১) আমরা থিয়েটার সংক্রান্ত বইপ্রকাশের ক্রমটি সাজিয়ে দিচ্ছিঃ-

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৮৯১-১৯৫২) জৈষ্ঠ্য ১৩৩০, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, প্রপ্র আশ্বিন ১৩৩০, পুনঃপ্রকাশ মহালয়া, ১৩৮৩, সেকালের নাট্যচর্চা সিরিজ, *রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা* , জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সুনীল দত্ত (সম্পা)।

বসু, দেবেন্দ্রনাথ (১২৬৭-১৩৪৫), শকুন্তলায় নাট্যকলা, ১৩৩৩, বরেন্দ্র লাইব্রেরি (ভূমিকায় উল্লেখিত আছে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে লিখিত ও *রূপ ও রঙ্গ* পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত)

দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ (১২৮৫-১৩৬৯), *গিরিশচন্দ্র*, ১৩৩৫, কালীতারা প্রেস।

গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র আশ্বিন ১৩২০, *গিরিশচন্দ্র*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। (পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ)।

সেন, কুমুদবন্ধু, ১৩৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, গিরিশচন্দ্র, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণটি অবশ্যই ১৩৩৫ এর আগে প্রকাশিত কেননা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর গ্রন্থে ‘আর একজন গিরিশ স্মৃতির সুদক্ষ লেখক, সুসাহিত্যিক’ কুমুদবন্ধুর কাছে ঋণস্বীকৃতি আছে। হেমেন্দ্রনাথের বইটির ভূমিকা লেখক শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বসু, যিনি সম্পর্কে ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গিরিশ বক্তৃতা দেন এবং গ্রন্থাকারে সেটি প্রকাশ পায় ১৯৩৯ সালে।

দাসী বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪২), *আমার কথা,* প্র প্র ১৯১২ বলে উল্লেখিত, পরে পুনরায় প্রকাশ পায়, এবং চলিত গদ্যে লেখা আমার অভিনেত্রী জীবন, প্র প্র *রূপ ও রঙ্গ* পত্রিকায় ১৯২৫–এ। দ্র. দাসী বিনোদিনী, পৌষ ১৩৬১, *আমার কথা,* কথাশিল্প, চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র আচার্য নির্মাল্য (সম্পা)।

অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে বাংলা থিয়েটার নিয়ে সামগ্রিক শ্রদ্ধা ও চর্চার যে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হল, এবং তা মূলত গিরিশচন্দ্রের অবদানকে মনে রেখে, সেখান থেকে বাংলার রঙ্গালয় আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্থান করে নিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরপর অনেকেই গিরিশ-বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯২৬ সালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৬৭-১৯৫৯), অভিনেত্রী তিনকড়ি (১৮৭০-১৯১৭) বিনোদিনীদের নিয়ে শুরু করেছেন 'নাট্য-প্রতিভা সিরিজ'। শুধু তাই নয়, এমন কি অভিনয়কলা নিয়েও তত্ত্বকাঠামো নিরূপণের চেষ্টা দেখা যায় নাট্যকার অভিনয় শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১২৮৬?-১৩৪৫) লেখেন *অভিনয় শিক্ষা*। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়, ১৩১৮ সালের শেষদিকে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আগ্রহে তিনি *নাট্যমন্দির* পত্রিকায় অভিনয় নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৩২৩ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়ে তিনশো কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই বই ছেপেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ভূমিকা লিখেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। যদিও বহু চেষ্টাতেও এর প্রকাশকাল উদ্ধার করা যায় নি।

২) রায়চৌধুরী সুবীর, মজুমদার স্বপন (সম্পা), ১৯৭২, *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার,* তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১১।

৩) বসু, মন্মথমোহন, ১৯৪৮, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গিরিশ বক্তৃতামালা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৬৮। Mukherji, Sushil,?, *The Story of The Calcutta Theatre*, K.P. Bagchi & Company.

৪) *The Bengali Drama, ITS ORIGIN AND DEVELOPMENT*, 1930, P.Guhathakurta, KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO LTD, LONDON.

৫) প্রণিধানযোগ্য একটি মত- প্রথমত ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় নতুন যে নাট্যসংস্কৃতি তৈরি হয় যাত্রা আদিতে তার কোনো 'মডেল' হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, কোনো যাত্রা পালা বাংলা সাহিত্যের একটি গ্রহণযোগ্য সংকলনে স্থান পাবার মতো শিল্পোন্নত সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। সরকার, পবিত্র, মার্চ ২০০৮, 'যাত্রাঃপ্রিয় পরম্পরা', *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ,* অখণ্ড দেজ সংস্করণ, পৃ ৩৮৬।

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৮৯১-১৯৫২) ১৩৯৮, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬),* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ৩০।

৭) দ্রষ্টব্য চৌধুরী, অহীন্দ্র (১৮৯৫-১৯৭৪), মাঘীপূর্ণিমা ১৩৬৫, *বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র,* ১৯৫৭ সালে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, বুকল্যান্ড, পৃ ৩৫।

৮) দৃশ্যাঙ্কন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই চিত্রগুলির 'পারস্পেকটিভ', মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভালো হইতে পারিত; ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভালো হইয়াছিল। দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৩৯৮, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬),* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ২৪।

৯) বসু, মন্মথমোহন, ১৯৪৮, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গিরিশ বক্তৃতামালা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৩৫।

১০) দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্য, শঙ্কর, আগস্ট ১৯৮২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান,* ১খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২,৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪-২৬।

১২) দ্র সমাদ্দার, শেখর, ১৯৯৬/২০১৮, 'পিটার ব্রুকঃভূমি থেকে আকাশে', *স্যাস* নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪৪-১৫২। গত শতাব্দীর আটের দশকের শেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেকসপিয়ার অধ্যাপক অমিতাভ রায় রবীন্দ্রসরোবর লেকের কাছে 'ওপেন স্পেসে' সোফোক্লেসের ক্লাসিক *আন্তিগোনে* করেছিলেন এবং ঐ একই এলাকায় মণিপুরের প্রসিদ্ধ নির্দেশক রতন থিয়াম তাঁর কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার নিয়ে একটি 'শোকেস ফেস্টিভ্যাল' করেন।

১৩) নবীন বসুর থিয়েটার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়- সান্যাল, কৌশিক, *নবীন বসুর থিয়েটার,* ১৯৯৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, অনুষ্টুপ।

১৩[এ]) "...ইংরাজি পাঠকদের সুবিধার্থে বলা যেতে পারে যে,এই নাটকটি অনেকটাই শেকসপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'এর মতো"। সান্যাল, কৌশিক, ২০০৮, *নবীন বসুর থিয়েটার,* পৃ ১৬।

শ্রী সান্যাল দেখিয়েছেন, মহেন্দ্রলাল বিদ্যানিধি ছিলেন *হিন্দু পাইওনীয়ার*-এর লেখাটির পিছনে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন এবং *ইংলিশম্যান, বেঙ্গল হরকরা* প্রভৃতি পত্রিকার বিরোধিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। শ্রী সান্যাল প্রমাণ করেছেন, ঠিক নবীন বসুর কারণে নয়, মূলত *বিদ্যাসুন্দর*-এর অশ্লীলতাই ছিল উক্ত অভিনয়ের বিরোধিতার কারণ।

সেই কারণে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) এর শোভাবাজার রাজবাড়ির 'অশ্লীলতামুক্ত' *বিদ্যাসুন্দর* পালটা সমালোচিত হয়েছে।

১৪) ১১ সংখ্যক সূত্র, পৃ ৪৬।

১৫) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (৩৫ খণ্ড) এর উক্তির সহায়তায় বাংলা নাটকের ইতিহাস শুরু করেছেন *কুলীনকুলসর্বস্ব*-কে দিয়েই। দ্র দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ, দোলপূর্ণিমা ১৩৫৪, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, পৃ ১৩-১৪। তারপরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মধুসূদনের নাটক।

১৬) কৌশিক সান্যাল *বেঙ্গলী* পত্রিকার সমালোচনা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দর প্রযোজনায় যাত্রাগানের অধঃপতনের যুগে স্ত্রী-ভূমিকায় ছোকরা অভিনেতারা যে কুরুচিকর অভিব্যক্তির বিশেষ বাহক হয়ে উঠেছিল সে ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই... অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রে অবতীর্ণ যুবকদের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি এতই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল যে, সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনে হয়েছিল-এর চেয়ে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীর প্রবর্তনই বোধহয় ভালো ছিল। দ্র. সান্যাল, পূর্বোক্ত, ১৯৯৭, পৃ ৩৯।

১৭) 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের একশো বছর পরেও দেখা যাচ্ছে বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। একদল বলেছেন বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয় আসলে প্রাচীন যাত্রা আর পাঁচালীর এক উন্নত ও আধুনিক সংস্করণ। আরেক দল বলেছেন, বাংলার এই আধুনিক নাট্যকলার উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'রামলীলা' উৎসবের পদ্ধতি অনুসরণে। আর তৃতীয় দল বলেন, বাঙালীর নাট্যশালা ইংরেজী নাট্যশালার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সান্যাল, কৌশিক, পূর্বোক্ত, ১৯৯৭, পৃ ২৭।

১৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ, ১৩৯৮, 'ছেলেবেলা', *রবীন্দ্ররচনাবলী,* ১৩ খণ্ড, সুলভ, পৃ ৭১৮।

১৯) ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, অগাস্ট ১৯৬৯, 'নট চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর', *গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড,* সাহিত্য সংসদ, রায়, রথীন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পা)।

২০) ১১ সংখ্যক সূত্র, পৃ ৯৮-১২৯।

২১) *ন্যাশনাল পেপার, ইংলিশম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান মিরর* দফায় দফায় বিজ্ঞাপন, প্রচার ও সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেছে। বিস্তারিত দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮-১১০।

২২) গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপে নবীনচন্দ্র সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* নাটকের ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ 'সাধারণী'র সমালোচনা, দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, আগস্ট ১৯৮২, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০) ১ম খন্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ ১৪৬-৪৭।

২৩) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬০।

২৩[এ]) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ৪।

২৪) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৬।

২৫) রায়, অমরেন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ (দ্বিতীয় সং ১৯৫৬), 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', *গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬) সমাদ্দার, শেখর, সেপ্টেম্বর ২০১৮, 'গিরিশচন্দ্রঃ বঙ্গনাট্যের স্বরূপ সন্ধানঃ প্রথম পর্ব', *গিরিশ কথা,* বসু ব্রাত্য, ভাদুড়ী, সত্য (সম্পা), মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, পৃ ১৭৩-১৮০। ওই, ২মার্চ ২০১৯, 'থিয়েটারের সত্য ও গিরিশচন্দ্রের আবেদন', প্রচ্ছদ কাহিনি ২ *দেশ,* সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা), পৃ ২২-২৪।

২৭) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, জুলাই ১৯৯৩, *নাট্যাচার্য শিশিরকুমার,* পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। ,

২৭[এ]) দুটি গ্রন্থ এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য।

ক) ঘোষ, দেবীপ্রসাদ, (সংকলিত-সম্পাদিত) মে ১৯৯৭, 'শিবরাম-শিশির বিতর্ক' *স্যাস* নাট্যপত্র প্রকাশনা। খ) রক্ষিত, মলয়, ২০২১, শিশিরকুমার শিল্পীর ধর্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বিন্দুবিসর্গ।

২৮) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঘোষ, দেবীপ্রসাদ (সংকলিত-সম্পাদিত), পূর্বোক্ত।

২৮[এ]) এ প্রসঙ্গে বাংলার অভিনয়ের ধারা বিষয়ে স্যাস পত্রিকার আসন্ন ৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য শেখর সমাদ্দারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আমরা এই প্রবন্ধের খশড়ারূপ পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছি।

২৯) চৌধুরী, অহীন্দ্র, মহালয়া ১৩৬৬, 'পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ', *বাঙালির নাট্যচর্চা*, শঙ্কর প্রকাশনী, পৃ ৪৯-৬৬।

৩০) গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, ১৯২৭/ ১৯৭৭, *গিরিশচন্দ্র*, স্বপন মজুমদার (সম্পা), দে'জ, পৃ ৬৬।

৩১) সেন, কুমুদবন্ধু, পৌষ ১৩৪২/ ডিসেম্বর ২০১৬, *গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার*, তালপাতা, পৃ ২৭।

৩২) পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪-৩৫।

৩৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৩।

৩৪) পূর্বোক্ত, পৃ ১০৫।

৩৫) ওই, পৃ ১১৪-১৫।

৩৬) ওই, পৃ ২০২।

৩৬[এ]) প্রহসনটির আদত নাম ছিল গজানন্দ ও যুবরাজ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলবশত তাকে গজদানন্দ করেছেন। দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, ১, পৃ ১২৪।

৩৭) চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল, অক্টোবর ১৯৭৮, 'চা-কর দর্পণ ও কুলি-প্রসঙ্গ', *বহুরূপী* ৫০, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা)

৩৮) চক্রবর্তী, কেয়া, অক্টোবর ১৯৭৭, 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলঃকাউন্সিলে বিতর্ক', *বহুরূপী* ৪৮, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ ১৮-৩৯।

৩৯) গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, ১৯২৭/১৯৭৭, *গিরিশচন্দ্র*, মজুমদার, স্বপন (সম্পা) দে'জ, পৃ ১৩০।

৩৯) দ্র শিশিরকুমার রচনাসংগ্রহ সংকলনে নাট্যাচার্য-র রবীন্দ্রনাথ ("রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ"এবং জাতীয় নাট্য বিষয়ক ("জাতীয় নাট্যশালার রূপ") প্রবন্ধাবলী, ২০০৭, দেবকুমার বসু (সম্পা), নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, পৃ ৪৮-৫৪, ১০০-১০২।

৪০) সেন, কুমুদবন্ধু, পৌষ ১৩৪২/ ডিসেম্বর ২০১৬, *গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার*, তালপাতা, পৃ ৩৬-৩৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার, সমাজ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবনা অধ্যায় থেকে প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনায় যে রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দেখা যাবে বাংলা থিয়েটারে যখন যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে সেসবের সমকালীন প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি উত্তরকাল তাকে কীভাবে দেখছে তা বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেকটা এইভাবে একটি নাট্যকে তার শৈল্পিক গুণাগুণের বাইরেও তার দেশ-কাল-রাষ্ট্রের প্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়েছে, সুতরাং কেবল নিন্দা-প্রশংসার বাইরে প্রকৃত 'সম-আলোচনা' হয়ে উঠার ইতিহাস এই পর্বেই এসে ঘটতে পারল। বিশেষত মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠল এই থিয়েটার-চর্চার মূল চালিকাশক্তি, ফলে রাজনৈতিক প্রশ্নেই এই সময়ের নাট্য-সমালোচনা অনেক সময়েই তৈরি করেছে বিতর্ক, কখনো কখনো বিদ্বেষ, এবং এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণেও পর্যবসিত হয়েছে সে আলোচনা। এই অধ্যায়ে সেইসব বিতর্ক বিদ্বেষের ইতিহাসও প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসবে।

গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার

সকলেই জানেন যে ১৯৪৮ সালের মে মাসে 'বহুরূপী' নামে প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্যদল, যার প্রথমে নাম ছিল 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়'-সেই থেকে গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত। এই সময়ে 'মুখোমুখি' নামে একটি নাট্যদল ২০২৩-কে 'গ্রুপ থিয়েটারের ৭৫ বছর' পূর্তি বিবেচনায় বিশেষ নাট্যোৎসব করছেন। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার কি আদতে একটি সম্পূর্ণ নতুন পথের নাম নাকি এর মধ্যে শিশিরকুমার-উত্তর পেশাদার রঙ্গালয় কিংবা চিন্তাচেতনায় ধরনে-ধারণে তার পূর্বসুরি

গণনাট্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল? আমাদের বিচারে সূচনাপর্বের পর বাংলা থিয়েটার আবার একটি বড়ো প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াল ১৯৪৮ সালে। কিন্তু কি কি প্রশ্ন থেকে এই অভিযাত্রা শুরু হল, তা একবার বুঝে নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শিশিরকুমারের সমকালেই শুরু হয়েছিল গণনাট্য এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা 'নবান্ন'। এই প্রযোজনাটি না ঘটলে এই বঙ্গে সমান্তরাল ধারার অব্যবসায়িক নাট্যধারার জন্ম হত না। আরও ঠিকঠাক বলতে গেলে বলতে হয়, তিরিশের দশকে জার্মানিতে অ্যাডল্‌ফ হিটলারের অভ্যুত্থান এবং এপ্রিল ১৯৩৬-এ প্রথমে লক্ষনৌতে তৈরি হয়েছিল একটি কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' (Anti Fascist Progressive Writers Association)। এর নাম নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে, কিন্তু তা আমাদের আলোচ্য নয়। কলকাতায় ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে গড়ে উঠল এর কেন্দ্র, যেখান থেকে ১৯৪২ সালে গড়ে উঠল Indian Peoples Theatre Association, সংক্ষেপে IPTA, বাংলায় যার নাম 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ বিষয়টিকে 'একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন' হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩-৮৭) তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন, *৪৬ নং, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*[১]। এও মনে রাখা দরকার এই সংগঠনে শুরুর দিকে অ-মার্ক্সবাদী এমন কি জাতীয়তাবাদী মানসিকতার লেখকরাও অনেকে যুক্ত ছিলেন, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-৬৫) প্রমুখ। এমন কি বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-৭৮) নিজেও যৌবনে ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের শরীক। সেই সুবাদেই *নবান্ন* নাটক যা কিনা আসলে মেদিনীপুরের আদলে আমিনপুর হয়ে ওঠে, সেখানে প্রথম দৃশ্যটি গড়ে ওঠে মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২)-এর ছাঁচে। বৃদ্ধা পঞ্চাননীর মিছিলের সর্বাগ্রে এগিয়ে যাবার দৃশ্যটি নিশ্চিতভাবে মাতঙ্গিনী হাজরাকে[২] মনে করায়। বলা বাহুল্য শুরুর দিনের এই সহজতা মত ও পথের ভিন্নতায় ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে, ফলে যে আন্দোলন

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল কালের আহ্বানে, সেই আন্দোলন ক্রমশ এক নির্দিষ্ট মতাদর্শে চালিত হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে অনৈক্য তৈরি হয়েছে 'গণনাট্য' পর্বে, যা এর ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু গণনাট্য 'আন্দোলন' বড়ো, নাকি তার প্রথম এবং চূড়ান্ত পরিচয় *নবান্ন*- তা একটি বিতর্কিত বিষয়। আমরা এখানে তিনটি নমুনা পেশ করব। প্রথমটি শ্রীমতী শোভা সেন[৩]-এর স্মৃতি থেকে।

> 'নবান্ন' উপলক্ষে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখা ছিলঃ বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকারের চাহিদা মেটাতে পারছে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অর্ন্তদ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে উঠতে প্রয়াস পেল...গণনাট্য সংঘের উৎপত্তি হচ্ছে জাতীয় সংগ্রামের ফল। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিই এগিয়ে এসেছিল পথপ্রদর্শক হিসেবে। পার্টির ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ছিল গণনাট্য সঙ্ঘ। তাই সাম্যবাদে বিশ্বাসী বা বিশ্বাসী নয় এমন বহু শিল্পী অনেকেই এই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয়েছিলেন।

পার্টির নির্দেশেই শোভা সেন জেনেছিলেন, বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাট্যপ্রযোজনায় তাঁদের 'গুরু'। পরে তাঁর আলাপ হয়েছিল শম্ভু মিত্র (১৯১৫-৯৭)-এর সঙ্গে, গুরুগম্ভীর রাশভারী মানুষ, ইনিও শিক্ষক। দুই শিক্ষকই তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এই কিছুদিনের মধ্যেই গোটা নবান্ন শিল্পীগোষ্ঠী এক নবান্ন পরিবারে পরিণত হয়েছিলাম। (পূর্বোক্ত)। এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-৭৬)-এর একটি নিবন্ধের[৪] এই অংশ-

> অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ থেকে আরম্ভ করে শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত সমস্ত মহারথী ছিলেন একক সূর্যের উপাসক...তখনকার নাট্যপ্রয়োগ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার সঙ্গে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যাভিচারগ্রস্ত জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পরিপুষ্ট এক বিশেষ ধরণের নটীরা সুযোগ সুবিধে পেতেন তখনকার বিভিন্ন মঞ্চকে ঘিরে যে ক্লেদাক্ত ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হত, তার কিছু কিছু রেশ আমরাও দেখেছি... এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিজনবাবুর নেতৃত্বে গণনাট্য সঙ্ঘের আবির্ভাব।... বিজনবাবুই প্রথম দেখালেন

কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয়ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কী করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়।

শোভা সেনের সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও 'নবান্ন' এর কৃতিত্বের ভাগ ঋত্বিক শম্ভু মিত্রকে কেন দিতে চান নি, তার কারণ এখানে অন্তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে ইন্দো-সোভিয়েত জার্নালে কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২) একটি দীর্ঘ ইংরেজি লেখা লেখেন। আমাদের বিচারে শিশির যুগের পর আমরা ঠিক যে সমাজ রাজনৈতিক তথা শিল্পসচেতনতা সম্পন্ন সমালোচনার যুগসূচনার কথা বলছিলাম, এই দীর্ঘ লেখাটি তার প্রথম নিদর্শন হতে পারে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মায়ারহোল্ডের থিয়েটারের উদাহরণ এনে কবি ও সমালোচক বলেন[৫]-

To them it was an emotional call to action as any speech, any distribution of leaflets or any newspaper report...But there is Mayerhold's theatre in Moscow, after the revolution. If-yes, we all said that, if only the conditions were different, the theatrical conditions and social climate!

...The crowded and deeply moved audience, the hostility of the professional theatres, the very good demand for repeat performances, all these prove the I.P.T.A's revolutionary role in the art of the Bengal!

এই লেখাতে স্পষ্টতই শম্ভু মিত্রকে নির্দেশকের কৃতিত্ব দিয়ে বলা হয়েছে- Shambhu Mitra set the tone of the composition by very simple means and the bare chronicle achieves the wholeness of a work of art... Meyerhold contends that in the theatre the reality must exist not on the stage but in the minds of audience. So Shambhu can succeed with the bare gunny back-cloth and can bring in the insulting relief- kitchens we actually had in calcutta... বিজন ভট্টাচার্যকে এই কর্মকাণ্ডে[৬] এক সম্মানজনক স্থানে বসিয়ে বলা হয়েছে- nor

had we seen before a playwright-cum joint producer and actor like Bijan Bhattacharya.। নবান্ন নাটকের স্মরণিকাতেও পরিচালনায় শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নাম ছিল।[৭]

বস্তুত 'নবান্ন' শুধু বাংলা থিয়েটারেই নয়, বাংলা থিয়েটার, বাংলা নাটককে মূল্যায়ন ও সমালোচনা করার নতুন মানদণ্ডও নির্মাণ করেছে। আমরা তাই দেখতে পাই বুদ্ধিজীবী সমাজবিশ্লেষক দর্শকের মতামতে। সমালোচক রঙ্গীন হালদার (১৮৯২-১৯৭৯)[৮] লিখছেন-

> ...সমস্ত জুড়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত অতিরিক্ত বচনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) অভিনয়কলার পরিচয় রেখে গেছেন। এবার এই প্রথম দেখলাম অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সমস্ত জুড়ে একটি ঐক্য রীতির প্রয়োগ...বাংলা নাট্যকলা বাঙালি জীবনের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে।...এ নাটক নাট্যসাহিত্য হিসাবে যে সার্থক তা দর্শকদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়...সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাংলার নাট্যকলার এই চতুর্থযুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না।

অনুমেয়, চতুর্থ যুগ বলতে লেখক ১) বাবু থিয়েটার ২) পেশাদার রঙ্গালয় ও গিরিশযুগ ৩) শিশিরকুমার ও নবযুগ ৪) গণনাট্য যুগ-এইরকম ভাগ করতে চেয়েছেন।

কমুনিস্ট পার্টির দু দুটি পত্রিকা *স্বাধীনতা* আর *জনযুদ্ধ*-র পাশাপাশি এই সময়ে হিরণকুমার সান্যাল (১৮৯৯-১৯৭৮) ও গোপাল হালদার (১৯০২-৯৩)-এর সম্পাদনায় *পরিচয়* পত্রিকাও[৯] কমুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এই পত্রেই 'নবান্ন' নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সব নিবন্ধ বেরিয়েছে, এবং নানা বিতর্কও হয়েছে। তাছাড়া *আনন্দবাজার* (৭/১/১৯৪৪), (২৭/১০/১৯৪৪), *জনযুদ্ধ* (৮/১১/১৯৪৪), *যুগান্তর* (২৭/১০/১৯৪৪) ও *অরণি* (৮/১১/১৯৪৪), (২৭/১০/১৯৪৪) এবং একাধিক ইংরেজি পত্রিকাতেও গণনাট্য ও তার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা সবচেয়ে জরুরি দুটি লেখা উদ্ধৃত করি। একটি ছাপা হয় *অমৃতবাজার পত্রিকায়*[১০] October 28, 1944 তারিখে-

> On Friday evening last we had the occasion to witness a unique performance at the Srirangam Theatre....There was an air of professional seriousness about the whole thing...A team was perfect and the individual acting superb. For the first time since Dinabandhu Mitra's 'Nildarpan', a truly peasants' drama has come upon the Bengali stage.

পরেরটির লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) লিখেছিলেন[১১] *পরিচয়*-এ চৈত্র ১৩৫১য়। তখন জানা হয়ে গেছে শ্রীরঙ্গম আর গণনাট্য সঙ্ঘকে মঞ্চ দিচ্ছেন না। সেই পরিপ্রক্ষিতে মাণিকবাবু লিখছেন- সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা ভয় পেয়ে গেলেন...এঁদের ভয় দর্শক সাধারণের রুচির পরিবর্ত্তনে। এর আগে তিনি লিখেছেন এই লেখাতেই – এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্ত্তব্য সম্পর্কে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্ব্বলতাও নেই।

আমরা সবাই জানি 'নবান্ন' নাটকের এতবড়ো সফলতার পরেও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে ভাঙন দেখা দেয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু আগে থেকে। সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে ছিল, পার্টির মতাদর্শগত লাইন বদল, শিল্পীর আত্মাভিমান ও মতের সঙ্ঘাত, দেশভাগ ও স্বাধীনতা-কালে শিল্পীদের অবস্থান, পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া ইত্যাদি। এ নিয়ে এতাবৎকালে যা যা চাপানউতোর হয়েছে সে বৃত্তান্তে আমরা যাব না, আমরা কেবল দেখব, তার কিছু প্রতিক্রিয়া। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়[১২] (১৯১৯-২০০৩) নবান্ন হয়ে যাবার পঁচিশ বছর পর এক লেখায় সেদিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লেখেন- পেশা আর পয়সা এক নয়। রোজগার জিনিসটা পেশাকে টিঁকিয়ে রাখার উপায় মাত্র...আসলে মানুষের হাত ধরে থাকা। ছেড়ে দিলেই কলাকৈবল্যের রসাতলে তলিয়ে যাবার ভয়। নবান্ন-র আগে হোক, পরে হোক-এ হল শিল্পের ভেতর আর বাইরেকে মেলাবার চিরকেলে সমস্যা। কেন্দ্রীয় দল থেকে রবিশঙ্কররা আগেই ছুটে গিয়েছিলেন, যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁরাও আর শেষ পর্যন্ত তিষ্টোতে পারলেন না। যে অতিবিপ্লবীরা গলায় রসুড়ি দিয়ে গান বার করতে চেয়েছিলেন, 'মাথার ওপর ঝুলছে খাঁড়া' হেঁকে স্টেজ খালি করে তারাও একদিন বেরিয়ে গেলেন। অপাংক্তয় হয়ে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শম্ভু মিত্র। বিজন ভট্টাচার্য ছটফট করে বেড়ালেন।

লেখার শেষে অবশ্য তিনি আবেদন রেখেছিলেন, আবার ‘নতুন নবান্নের দিন’ গড়ে তোলার কিন্তু তা আর সম্ভব ছিল না।

১৯৪৮এর ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রী শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছাড়েন। গান্ধী হত্যার সাত দিন পর। যে সংগঠন তাঁর নেতৃত্বে শুরু হল, তিনি অন্তত নিজে তাঁর সম্পর্কে বারবার বলেছেন এও এক আন্দোলন- ‘নবনাট্য আন্দোলন’। এবং এই নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছে। গণনাট্যে থাকাকালীন যেসব সমালোচনা ওঠেনি, পরবর্তীকালে পরোক্ষভাবে সেইসব অভিযোগ তোলা হয়। একথাও বলা হয়, ‘নবান্ন’ নাটকে গণসংযোগ তৈরি করার চেয়ে শিল্পগত উৎকর্ষ, দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ‘নবান্ন’ গণনাট্য আন্দোলনকে পরিচিতি দিচ্ছে, সেইই আবার গণনাট্য আন্দোলনকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত[১৩] করছে। তাছাড়া আধুনিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া নাকি ‘নবান্ন’ অভিনয়ে শম্ভু মিত্র উৎসাহী ছিলেন না, বিজন ভট্টাচার্যের ‘অবরোধ’ ও ‘জীয়নকন্যা’ অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন না, নাটককার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘নীলদর্পণ’ নাটক নিয়ে শম্ভুবাবুর আপত্তি ছিল। তা বাদে ১৯৪৬এর মে মাসে রবীন্দ্রপক্ষে শম্ভু মিত্র পরিচালিত ‘মুক্তধারা’ নাটকের অসাফল্য, তদুপরি ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা (স্মর্তব্য উৎপল দত্তের ‘কল্লোল’ নাটকে ১৯৪৬-এর বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পিছনে এইরকম কারণ দেখানোর অপরাধে শ্রী দত্তের গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটবে) তদুপরি ৪৬এর দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা এবং ৪৮এর মার্চে পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা। যদিও ততদিনে শম্ভু মিত্ররা[১৪] বেরিয়ে গিয়েছেন। পার্টি নিষিদ্ধকরণের মুখে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে শম্ভু মিত্রের পক্ষের যুক্তি এই ...৪৮এর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংঘের এক সভায় একজন ‘মহর্ষিকে তুচ্ছ ক’রে’ কিছু বলায় শম্ভু মিত্রের মনে হয়, গণনাট্য সংঘে সক্রিয়ভাবে আর কিছু করা যাবে না। বলা হয়েছে যে তাঁরা কেউ সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে গণনাট্য ছাড়েন নি, যে-শিল্পভাবনা ও নাট্যাদর্শ নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন, যখন দেখলেন

গণনাট্য সংঘে তার চর্চা ও বিকাশের সুযোগ খর্ব হয়ে আসছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরিয়ে নিলেন নিজেদের।[১৫] এমন কি 'বহুরূপী'তে থেকেও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিনয় করেছেন গণনাট্যের নাটকে, এবং ১৯৫২ সালেও গণনাট্য সংঘের কার্যবিবরণীর প্রাদেশিক সংবাদে শম্ভু মিত্রের প্রতিবেদন[১৬] ছাপা হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, 'বহুরূপী' এবং তার কর্ণধার শম্ভু মিত্রই প্রথম 'নবনাট্য' কথাটি ব্যবহার করলেন এবং একে একটি 'আন্দোলন' বলে আখ্যাত করলেন। 'বহুরূপী'-র সদস্যদের স্মৃতি থেকে জানা যায় 'নবান্ন' অভিনয় (১৩/০৯/১৯৪৮) অসফল হবার পর তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)-এর নাটক 'পথিক' অভিনয় করা হল (১৬/১০/১৯৪৯)। এই নাট্য প্রযোজনার আগে, মিত্র দম্পতি একটি ছবির কাজে মুম্বই গেলেন। সেখান থেকে শ্রী মিত্র যে চিঠি লিখতেন, তার থেকে উদ্ধৃত করি আমরা ভয়ানক নতুন একটা কাজ করতে চলেছি, নাটকের আন্দোলন যে করতে নেমেছে মনে থাকে সে এক প্রচণ্ড দূরূহ artistic কাজ করতে নেমেছে, আমাদের মধ্যে একটা fanatic zeal না থাকলে আমরা doomed. খালি আমরা doomed হলে ভাবনা ছিল না, আন্দোলনও doomed.[১৭] সেই 'নবনাট্যে'র লক্ষণ কী কী এবারে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা যাক।

আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখব, প্রথম দফায় 'নবনাট্য' কি, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন থিয়েটারের লোকেরাই, হয় নাটককার, নতুবা নির্দেশক বা অভিনেতা। সমালোচক নন। যতদূর মনে হয়, 'বহুরূপী'-ই এই সংস্থা, যাঁরা পূর্বজদের ঐতিহ্য মেনে তাঁদের সর্ব অর্থে সফল প্রযোজনা 'রক্তকরবী'-র (১৯৫৪) পরের বছর থেকে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা (বছরে দুটি করে সংখ্যা) প্রকাশ করতে শুরু করলেন, তাঁদের স্ব-নামে, এবং সেই ঐতিহ্য কিছুকাল আগে অবধি, 'বহুরূপী' সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবার আগে অবধি অব্যাহত ছিল। সম্প্রতি সমকালীন এক নাট্যসমালোচক পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।[১৮]

বহুরূপী পত্রের প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকার পরিকল্পক শম্ভু মিত্র 'নবনাট্য' বিষয়টির আলোচনায় জোর দিয়েছেন। তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'সংঘনাট্য ও নাট্য-আন্দোলন', (*বহুরূপী*, প্রথম

সংখ্যা, মে ১৯৫৫, পৃ ২৯-৩৫) শ্রী মিত্র নিজেও লিখেছেন নানারকম নিবন্ধ। তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর নিজের লেখা 'সমস্যার একটা দিক' নিবন্ধে বলছেন-

> আজ প্রায় দশ-বারো বৎসর ধরে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই দশ-বারো বৎসরে এর প্রসার ঘটেছে প্রচুর। কিন্তু তবু আন্দোলনের মধ্যকারের লোকেরা ভরসা পাচ্ছে না। কারণ প্রসার অনুযায়ী গভীরতা বাড়েনি...যে-কথা অন্তরের গভীরে গিয়ে ঘা দেয়, সে কথা বলা হয়ে উঠছে না...।[১৯]

এর কারণও তিনি কিছু কিছু দর্শিয়েছেন যেমন চাকরির জন্য বা সংসার চালাবার জন্য অন্য জায়গায় অভিনয় করতে গিয়ে 'নবনাট্য আন্দোলনের শিল্পী'দের অভিনয় করতে না পারা, মঞ্চের অভাব, ইত্যাদি। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, ব্যবসায়িক মঞ্চের নাটকের পাশাপাশি অন্য ধারার নাট্যাভিনয়ও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আর তাই কেবলই নির্দিষ্ট করতে চাইছিলেন নিয়মানুবর্তিতা, সঙ্ঘচেতনা, সততা ও অধ্যবসায়কে[২০]। তাঁর চিন্তনের সমর্থনে তিনি পেয়েওছিলেন কয়েকজনকে যেমন বর্ষীয়ান অহীন্দ্র চৌধুরিকে। তিনি সুস্পষ্ট করেই দেখাচ্ছেন-

> ১৯৪২ সাল পর্যন্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তাদের কাজ ও জাতি প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিল...যুদ্ধান্তে, প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লোকেরা ফাঁফানো অর্থের মজা লুটে ভাগ্য ফেরাতে লাগল...জনগণ তখন টাকা খরচ করতেই ব্যস্ত। নাটকগুলিও কোন রকম শিল্প-বিষয়ক উন্নতির চেষ্টা ছাড়াই এবং নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই অভিনীত হতে লাগল। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই রকমই চলল, এবং জনসাধারণেরও থিয়েটার সম্বন্ধে তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল।[২১]

শ্রী চৌধুরি অতঃপর দেখিয়েছেন কেমন করে জনপ্রিয় তারকাদের স্বচক্ষে দেখার ঝোঁকের কবলে পড়ল পাবলিক থিয়েটার, এবং, এই ঝোঁক কেটে গেলে যে নতুন নাটকের চাহিদা দেখা দিল, রঙ্গালয়গুলি তা পূরণ করতে পারল না। এই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিল 'কতকগুলি নাট্যসংস্থা', ভাষান্তরে যাদের শম্ভু মিত্র বলছেন 'নবনাট্য আন্দোলনকারী'।

তারা স্বতন্ত্রভাবে আধা পেশাদারী থিয়েটারের দল সৃষ্টি করে সুযোগ সুবিধা বুঝে বিনা প্রেক্ষাগৃহেই এখানে সেখানে অভিনয় শুরু করে দিল এবং কোন লাভ হলে সমবায় প্রথায় তা ভাগ বাটোরা করে নিতে লাগল...এই প্রগতিসম্পন্ন দলগুলির মাঝে মাঝে মূল্যবান ইউরোপীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং সিনেমা গৃহ সংগ্রহ করে কলকাতায় এবং তার আশে পাশে অভিনয় করা ছাড়া নিজস্ব কোন স্থানই নেই। একটা বা দুইটা নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ তাদের নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। সঙ্গতভাবেই এটা তাদের প্রাপ্য। প্রকৃত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারীরা যেমন প্রমোদকর থেকে রেহাই পায়, এদেরও তেমনি প্রমোদকরমুক্ত ভাবেই অভিনয় করতে দেওয়া উচিত।[২২]

আমরা শম্ভু মিত্রের যে প্রবন্ধের কথা আগে বলেছি, তাতে ঠিক এই বাস্তব পরিস্থিতির কথাই উল্লেখিত হয়েছিল। এসব বিষয়ে সমালোচককুল কি কিছু আলোকপাত করেছেন কোথাও? বলা বাহুল্য, তারা তখনও ততটা ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু তারই মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য আনবার চেষ্টা ছিল *বহুরূপী*-র তা নজর এড়ায় নি। ১৬ অক্টোবর ১৯৪৯-এ রেলওয়ের ই বি আর ম্যানসন ইন্সটিটিউটে প্রথম অভিনয় হল তুলসী লাহিড়ি বিরচিত ‘পথিক’, কিছুদিনের পর এই নাটক চলে এল নিউ এম্পায়ারে। সংবাদপত্রে লেখা হল-

ক) সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগপদ্ধতি ও অভিনয়ধারার প্রভাব থেকে এরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আর সেই জন্যেই নাটকখানি বাঙ্গালা দেশের নূতন নাট্য আন্দোলনের গতিকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

খ) ধারাবাহিকভাবে এই ধরণের শিক্ষামূলক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে, বাংলার নাট্যমঞ্চের একঘেয়েমীর হাত থেকে দর্শকসাধারণ রেহাই পাবে।

গ) The entire action of the play, divided into three acts, took place in one set, which is also a bold departure from our existing stage practice.

'উলুখাগড়া'- য় প্রশংসা পেয়েছে এর সেট- একটি পর্দার পাশে একটি জানালা আর একপাশে একটি দরজা বসিয়ে এরা একটা কামরার আভাস এনে ফেলেন...এই ইংগিতময় মঞ্চসজ্জা সত্যিই শিল্পীজনোচিত এবং অভিনব। নাটককার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় তৃপ্তি মিত্রের অসামান্য অভিনয় প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কীর মায়ের কথা স্মরণ করেছেন।[২৩]

'ছেঁড়া তার' (প্রথম অভিনয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০) হবার সময়ে আরো বড়ো ঘটনা এই যে মঞ্চসজ্জায় খালেদ চৌধুরি (১৯১৯-২০১৪) এবং আলোয় তাপস সেন (১৯২৪-২০০৬) এসে গেছেন। 'পথিক' বা 'উলুখাগড়া'-র তুলনায় এই নাটক উত্তরবঙ্গের বাহে ভাষার জোরে, গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মুসলমান চাষীদের জীবন দুর্দশা প্রেম দাম্পত্য অভাব ইত্যাদি নানা অনুভব ও বাস্তবতাকে শিল্পসম্মত প্রয়োগনৈপুণ্যে বহুরূপীকে অনেক গুণ এগিয়ে দিল। শুধু তাই নয় *আনন্দবাজার, দৈনিক ইত্তেফাক, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টেটসম্যান* ভূয়সী প্রশংসা করল, হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮- ১৯৬৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) প্রমুখ এগিয়ে এলেন 'বহুরূপী'-র নাট্যরুচি নিয়ে আলোচনায়, নবনাট্যের নাটক হলেও বলা হল একে একটি প্রগতিশীল নাটক বলতে কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা জাগে না।[২৪]

বর্তমান অভিসন্দর্ভের যিনি তত্ত্বাবধায়ক, তিনি বাংলার একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও গবেষক। তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেছেন-

> আমি যখন রাজা সেনের পরিচালনায় শম্ভুবাবুকে নিয়ে নির্মীয়মান তথ্যচিত্রের গবেষণার জন্য ওঁর জ্যোতিষ রায় রোডের বাড়িতে যেতাম, তখন একদিন উনি বলেছিলেন, প্রগতিশীল শিবিরের অন্যতম নির্দেশক উৎপল দত্ত ও শ্রী মিত্রর বন্ধু তরুণ রায় (১৯২৭-১৯৮৮)-এর সঙ্গে নিউ এম্পায়ারে *ছেঁড়া তার* -নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। যে দৃশ্যে রহিমুদ্দী বসিরকে কাঁধে তুলে নিয়ে কলকাতায় বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করে, আর পিছনে খালেদ চৌধুরির লাইন ড্রয়িং-এ শহরের বাস ট্রাম বাড়ি ঘর সরে সরে গিয়ে গ্রামের পথ ঘাট ধানে গোলা চলে আসতে থাকে, বোঝা যায়, রহিম শহর ছেড়ে পায়ে

হেঁটে গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, উৎপল দত্ত হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিলেন, এই আমাদের ভারতীয় থিয়েটারের আত্মা।[২৫]

পরবর্তী নাটক 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র' এবং 'রক্তকরবী'। প্রযোজনা যথাক্রমে ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৪। 'রক্তকরবী' 'বহুরূপী'-কে সুবিপুল সাফল্য এনে দিয়েছিল, এবং একই সঙ্গে তা প্রগতিশীল শিবিরের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, কিন্তু 'চার অধ্যায়' এবং নবপর্যায়ে 'দশচক্র' (২৮ অক্টোবর ১৯৬২) নাটকের জন্য উক্ত শিবির সমালোচনা করেছে শম্ভু মিত্রকে।[২৬] বিশেষ করে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সমালোচনার কথা আমাদের বলতেই হবে।

অরুণা হালদার তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় 'রক্তকরবী'-কে বলতে চেয়েছিলেন 'বিপর্যয়ের নাটক', বলেছিলেন বিপ্লবও বিপর্যয়, কিন্তু বিপর্যয় মাত্রই বিপ্লব নয়।[২৭]

'বহুরূপী'র কৃতিত্ব এই যে-

> রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে সার্থক শিল্পী হিসাবে শম্ভু মিত্রের শিরে বর্ষিত হতো তাঁর আশীর্বাদের অভিনন্দন...রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর ছায়ার গুণ্ঠন সরিয়ে শম্ভু মিত্র সত্যের পর্যায়ে তাকে তুলে এনেছেন...সৌন্দর্য অসত্য নয়, একটা সত্যেরই স্বাভাবিক সুসমঞ্জস পরিণতি তা। এই পরিণতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে বহুরূপীর মঞ্চসজ্জায়। সেই রচনায়, জালের বেড়ার পরিকল্পনায়, আলোক সম্পাতে, আবহ সঙ্গীতে, পিছন থেকে অবসন্ন প্রায় সারি সারি মূর্ছাতুর কর্মীদের যাত্রাটি দেখে Plattoর Smile of the cave এর কথাটি মনে করিয়ে দেয়। নন্দিনী যে প্রাণচঞ্চলা মানবনন্দিনীই সেটি মনে হয় তার বেশভূষা শুদ্ধ একটি গাঁয়ের মেয়ের রূপে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে। অন্তরালবর্তী রাজার কণ্ঠের অপূর্ব 'হেলো এফেক্ট' আর শেষদিকে তার বার হয়ে আসা এই দুয়ের মধ্যে পড়ে দর্শকের মনে জোর ঘা লাগে; পরক্ষণেই কনফ্লিক্টের অবসর না রেখেই মন আশ্বস্ত হয়ে ওঠে-ভাবের ধোঁয়া কাটা সত্যের আবির্ভাবে-রাজার জন্যে তৈরি ভাবলোক চুপসে যায়-বিশ্বাসঘাতকতার চরম অধিকারে সর্দারগুলোর না-দেখা রূপও দর্শক দেখতে পেয়ে যায়। সংস্কৃত নাটকে জোর করে ট্রাজেডিকে ঢাকা দেওয়া হত দর্শকের কাছ থেকে-

এখানে ফুটে উঠল স্পষ্টত সমস্ত অমঙ্গল শঙ্কার ওপার থেকে পরাভূত হৃদয়ের জাগরণ, আশাপ্রদ অগ্রগতিতে বাস্তবধর্মী জয় পরাজয়ের অনিশ্চয়তায়।

সেই সময়ে 'রক্তকরবী' নিয়ে বিতর্ক হয়েছে নানারকম। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল, রবীন্দ্র-ভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে এই প্রযোজনায়, হয়ে গেছে শ্রমিক বিপ্লবের নাটক, *আনন্দবাজার* লিখেছিল এরা 'করবী'কে দলিত করে 'রক্ত'কে বড়ো করেছেন, আবার কারও মত ছিল যথেষ্ট আধুনিক হয় নি প্রযোজনাটি। সেইসব সমালোচনা মনে রেখে *পরিচয়* পত্রিকায় মার্ক্সবাদী সাহিত্য-সমালোচক হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন-

রক্তকরবীর প্রধান দুটি নায়ক রাজা ও রঞ্জন; তাদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত, প্রায় কাল্পনিক, আর একজন অদৃশ্য ও অবাস্তব। ওদের নিয়ে নন্দিনীর মতো জ্বলজ্বলে নায়িকা কী করে নাটক জমাতে পারে? তাই নাটক আসলে জমেছে নন্দিনীর সঙ্গে গৌণ চরিত্রগুলির সংঘাতে ও সহযোগিতায়। একদিকে যন্ত্রশিল্প নির্ভর অত্যাচারী পুঁজিপতি ও আমলা, আর একদিকে অত্যাচারিত শ্রমিক-তাদের প্রতিনিধি এই গৌণ চরিত্রগুলি। যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার আধার উৎস রক্তকরবীর রাজা, তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ এইসব গৌণ চরিত্রের মধ্যে। নন্দিনী এই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ...বহুরূপী যদি কোনো অপরাধ ঘটে থাকে তা এই যে রক্তকরবীর মধ্যে বাস্তবের যে মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠেছে তাকে মর্মস্পর্শীভাবে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলা।[২৮]

প্রযোজনার প্রশংসা সত্ত্বেও *আনন্দবাজার পত্রিকা* কী লিখেছিল মনে হয় আমাদের আরো বিশদে দেখা দরকার।

...আর পরিচালনার গুণও এমনি যে একটি মাত্র দৃশ্য অবিরাম প্রায় সওয়া *দুঘন্টা কোথা থেকে* যে পার করে দেয় সেদিকে কোন হুঁশই থাকে না। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তটিতে হুঁশ যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ মনে পড়ে যে এতো কৃতিত্ব দেখিয়েও নাটক থেকে যেন রবীন্দ্রনাথকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে নাটকখানির উপরে যবনিকা টানা হয়েছে যা নিতান্তই অরাবীন্দ্রিক।

মূলত নাটকের পরিসমাপ্তি ছিল যন্ত্র রুপি দানব ও দৈত্যপুরী থেকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য নন্দিনীর আত্মত্যাগের ওপরে, কিন্তু বহুরূপীর অভিনয়ে তা শেষ হয়েছে লড়াইয়ে যাবার শ্লোগান তুলে। সংগ্রামের মুখে চলে বিশু পাগলরা মুখে শ্লোগান 'চলো ভাই, লড়াইয়ে যাই' এটার মধ্যে শুধু স্থুলত্বই ফুটে ওঠেনি, আগাগোড়া এদের অভিনয় ভঙ্গি ও দৃশ্য পরিবেশ থেকে মনে করে তখন এইটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শ্রেণি বিদ্বেষ পরিহার করে গিয়েছেন এবং যাবার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন, বহুরূপী তা তো টেনে এনেছেনই অধিকন্তু একটা বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি মানুষকে সংগ্রামী হয়ে ওঠার জন্য উদ্দীপ্ত করারও চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাই অভিনয়টি রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী না হয়ে বহুরূপীর রক্তকরবীতে পরিণত হয়েছে- রবীন্দ্রনাথের ফুলটাই ছিল বড় কথা, বহুরূপীর অভিনয় জোর করেছে রক্তের ওপরে। বলা দরকার যে, বহুরূপী তাদের অভিনেয় রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভাষা অক্ষুন্ন ভাবেই অনুসরণ করে গিয়েছেন যোগ কিছু করেননি; কেবল শেষ কটা লাইন যা বিয়োগ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রস পরিবেশন করতে, এরা সে জায়গায় নাটকখানিকে কাজে লাগিয়েছেন সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার এক হাতিয়ার হিসেবে।[২৯]

আমরা মনে রাখব ভারতের জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠান প্রথম আয়োজিত হয়েছিল দিল্লিতে এবং সেখান বাংলার নাট্যদল হিসেবে 'বহুরূপী' একমাত্র অংশগ্রহণ করে এবং দিল্লির সপ্রু অডিটোরিয়ামে শম্ভু মিত্র প্রযোজিত 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী' মঞ্চায়িত করেন। তার সমালোচনা করে *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় সমালোচক লিখেছেন –

"Rakta Karabi" is one of the two plays Tagore did not succeed in staging during his lifetime. Indeed Bohurupee's production (four successful performances of which have been gave in Calcutta) is the first attempt to bring Tagore's fantasy in play for on the stage...

The curtain rises on a window covered by a network of intricate pattern in front of the place. The net of human greed and cruelty spreads further and farther

until it is torn to shreds by Nandini's presence and King's rebellion against his own creation.

In a play in which the abstract (personified by the King and Nandini) and the concrete (the gold diggers) are blended to a remarkable extant, the producer's difficulties in presenting it as stage drama are almost unsurmountable. To these are added the difficulties of preserving. Tagore's rich lines of poetry in a play which is at once real and unreal. The Bahurupee troupe should give the director (Mr. Shombhu Mitra) cause for satisfaction at having been able to put across so elusive a theme so successfully. Through two hours if tense drama moving in the extreme, we are brought face to face with the tragedy of man and his redemption.[৩০]

'রক্তকরবী'-র উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলির মধ্যে *মুখপাত্র* পত্রিকায় 'বহুরূপী' সম্পর্কে লেখা হচ্ছে-

...সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা একটি মাত্র নয়, তার অনেক অর্থ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্রের প্রযোজনা তাকে নতুন ব্যঞ্জনার মধ্যে সম্পন্ন করেছে। সঙ্কেত এর অর্থ রহস্যময়তা, কিন্তু অলৌকিকত্ব নয়। রহস্যময় বস্তু বহুক্ষণ ধরে মাথার মধ্যে চিন্তার খোরাক যোগায় রক্তকরবী বুঝি বা নতুন পথও তৈরি করে- এ নতুন শোভাও প্রযোজকের নতুন চিন্তার ফল, একথা অনস্বীকার্য। রসমোদীর পক্ষে তা এক নূতনতর আনন্দের পরিবেশক।

প্রতি ব্যক্তিকেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটা কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন... ফলাফলের ইঙ্গিত এই যে আপনার, শৃংখলে বদ্ধ শক্তি যখন নিরুপায় ক্ষোভে সবকিছু ভাঙতে চায়, সেখানেও সে তখন বাধা পায়, একটা বিপর্যয় বা বিপ্লবেই আসে মুক্তি... ঐতিহাসিক সত্যটাকে তিনি চিনেছিলেন মোটামুটি বুঝিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষে মানুষে ধনিকে – শ্রমিকের ভেদাভেদ। পরে 'রাশিয়ার চিঠি'তে একথার উল্লেখ আরো সুস্পষ্ট। রক্তকরবী সেই ঐতিহাসিক সত্যেরই

সংকেত। কিন্তু সে সত্যকে চিনলেও আপনার পরিপার্শ্বিকের মধ্য হতে তখনো রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে তাকে ধরতে চাননি। সত্যকে বোঝার বহু পথ এক্ষেত্রে নেই; একটাই পথ জীবন নিরীক্ষা। জীবন নিরীক্ষার নিকটে ধরা যে সত্য পড়ে না তা ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। তখন অনিবার্য কারণে সে ধোঁয়াটে ভাবটাকে একটা বিপদের আভাস বলে দেখাও দরকার হয়, অলৌকিকত্ব, রহস্যময়তা-অদৃষ্টবাদ, সৃষ্টি-ইউটোপিয়া সবই সেই চাহিদার ফল। সেই জন্যই মেটারলিংকের The Sightless নাটকের বিষয়বস্তু হল এক ভয়াতুরতা, আর রক্তকরবী চরম অবসান- অস্থির শঙ্কা বিপর্যয়..[৩১]

পরিচয় পত্রিকা 'রক্তকরবী'র নির্মাণ সম্পর্কে বলেছেন –

এই পরিণতি যে নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল না তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মহৎ শিল্পীদের হাতে মানুষের ইতিহাস ও মানুষের সমাজ যে মর্মস্পর্শী বাস্তব রূপে ধরা দেয় তা সবসময় তাঁদের সচেতন মনের সৃষ্টি নয়।

বহুরূপীর যদি কোন অপরাধ ঘটে থাকে তা এই যে রক্তকরবীর মধ্যে যে বাস্তবের মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠেছে, তাকে মর্মস্পর্শীভাবে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলা। এই ছবি যে বিশেষ একটি যুগের ও বিশেষ একটি সমাজ ব্যবস্থার এ সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ থাকতে পারতো তা ভঞ্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত রাজা চরিত্রের ব্যাখ্যায়। এরপরও যদি কেউ বলেন যে বহুরূপীর প্রযোজনা উগ্রভাবে আধুনিক হয়েছে তাহলে সমালোচকদের বলব আধুনিকতাবাদ দিয়ে রক্তকরবীর যে কী অপরূপ রূপ দাঁড়ায় তা নিজেরা অভিনয় করে প্রমাণ করুক।[৩২]

একদিকে যেমন বাহবা দিচ্ছেন কিছু সমালোচক অপরদিকে আবার 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী'র সম্পর্কে অনেক সমালোচকগণ তাদের বিরূপ মতামত পেশ করেছেন। যেমন হিরণ কুমার সান্যাল *পরিচয়* পত্রিকায় 'রক্তকরবী' সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন-

এমন কথাও শুনেছি যে এই অভিনয় যথেষ্ট আধুনিক হয়নি। অর্থাৎ আরো হওয়া উচিত ছিল। ও মতের কথা। তবে একথা মানি যে বহুরূপী যে সাজসজ্জা ও চলন বলনের উদ্ভাবন করেছেন তাতে অদল বদলের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছিজালের আড়াল, থেকে রাজা বেরোলেন যে সাজে

তাতে চমক লাগানোর চেষ্টা আছে কিন্তু চমক যদি লাগে তা কৌতুকের চমক, কেননা এ সাজ রাজোচিত নয়, বিপ্লবের নায়ক-এর উপযোগীও নয়। এই সাজে মঞ্চের উপর দাপাদাপি একটু বিপরীত রসের সৃষ্টি করে। তেমনি বিসদৃশ নেপথ্য বিহারী রাজার কণ্ঠ থেকে আবেগের কম্পন। অবশ্য নন্দিনীর ডাকে রাজা ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হয়ে যান, তার পৌরুষ টলমল করে। কেননা রাজার মধ্যে রয়েছে গুরুতর অন্তর্বিরোধ; এ অন্তর্বিরোধের উৎস সরসতার মনে। কিন্তু এ অন্তর্বিরোধ ফোটাতে হবে কি গলায় গিটকিরি দিয়ে? আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের বাণী আরো রাবীন্দ্রিক করে উচ্চারণের চেষ্টা শম্ভু মিত্রের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে, তাই তার মুখে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বা পদ্যের আবৃত্তি অত কানে লাগে।[৩৩]

শম্ভু মিত্রের বাচনভঙ্গি ও পোশাক-আশাক নিয়ে হিরণ কুমার সান্যাল যেমন বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন অপরদিকে ‘এল টি জি’-র প্রধান কাণ্ডারী উৎপল দত্ত তাঁর *পাদপ্রদীপ* নামক পত্রিকায় ‘রক্তকরবী’ সমালোচনায় বলছেন-

বাচনভঙ্গির স্পষ্টতা ও স্বাভাবিকত্ব এবং পোশাক-আষাকে নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে বহুরূপী এই স্বাতন্ত্র্যবহুল পরিমাণে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাই শ্রমিকদের হেট মাথা আর নম্বর মারা কামিজ আর হতাশার কথা তাদেরকে ‘ঠাস দাসত্ব আর নিবিড় ছুটির’ ‘এক চুমুকের তরল আগুনের’ অশরীরী দেশ থেকে উদ্ধার করে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছে।[৩৪]

একজন পরিচালক দর্শকের নজরে মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে দিকগুলোর কথা উল্লেখ করেছিলেন তাতে পরিচালক হিসাবে উৎপল দত্তের অপার দক্ষতার হদিশ পাওয়া যায় যা আমাদের মতে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে-

...বহুরূপীর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ রবীন্দ্রনাটকে মঞ্চসজ্জা। সেই ন্যক্কারজনক ফাঁকা মঞ্চের ঢং না দেখিয়ে, তার স্থলে তাপস সেনের অত্যাশ্চর্য আলোকসম্পাতে বিকশিত খালেদ চৌধুরীর দৃশ্যসজ্জা দেখে বোঝা যায় শম্ভুবাবু রবীন্দ্রনাটক বলে আলাদা অপার্থিব ধরনের কিছু নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাট্যই হোক, আর শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক হোক মঞ্চে ওঠার বেলায় তাকে মঞ্চের ঠাটে, মঞ্চের বিশেষ ঘরয়ানায় দীক্ষিত হতে হবে, কারণ- মঞ্চটা কলেজী আবৃত্তির কমনরুম নয়। কিন্তু আবার

পূর্বে উল্লেখিত কারণেই খালেদ চৌধুরীর গীতধর্মী দৃশ্যপরিকল্পনার সঙ্গে স্থূল বাস্তব চরিত্রগুলির প্রতি মুহূর্তে ঘটে সংঘর্ষসুর যায় কেটে, কেটে। ফাগুলাল চন্দ্রা আর নম্বর মারা শ্রমিকদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত বস্তিতে বা, প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে ল্যাম্পপোস্টের নিচে। দৃশ্যসজ্জায় বৃহত্তর রূপকের আমেজটা নিশ্চয়ই রাখা উচিত, কিন্তু হয় তা বর্তমান জীবনের নানা পরিচিত বস্তুর অতিরঞ্জিত চিত্রণের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত ছিল, অথবা চরিত্রগুলিকেই পাগড়ি আর রঙীন জোব্বা পরানো উচিত ছিল (তাতেই যে প্রতি চরিত্র সাংকেতিকতার নিগড়ে বাঁধা পড়ে যেত, তারই বা কী মানে? বলিষ্ঠ অভিনয়ে ওর মধ্যেও দর্শকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব)। আধুনিক রূপকে নিশ্চয়ই ঈষৎ বাঁকানো ল্যাম্পপোস্ট, দাম্ভিক অট্টালিকার অসংখ্য ইস্পাত আকার বেড়াজাল, বৈচিত্র্যহীন, নির্জীব খোলার ঘরের সারি এসব থেকেই নির্মিত হতে পারে এমন এক কাব্যময়, বিচিত্রবর্ণের দৃশ্যপট যা, প্রতিদিন দেখা স্থূল বাস্তবের পরিবেশটাকে রাঙিয়ে তুলবে, কল্পনার উদ্দামতাকে করবে সংযত, তার নানা খেয়ালের হেঁয়ালিকে দেবে এক একটা সহজবোধ্য রূপ, জীবনের খন্ডচিত্রের মধ্যেই আনবে মহাজীবনের সম্পূর্ণতা, আবার মহা জীবনের জটিল দর্শনকে বাধবে খন্ডচিত্রের স্বল্পপরিসরে।

তিনি আরো বলেছেন ...রক্তকরবী দেখে অবশ্য অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলা যায় না- এটি হলো যাত্রার প্রভাব, আর এটি সর্বাধুনিক ইউরোপীয় মঞ্চ পরীক্ষার ফল। কারণ অঙ্গাঙ্গী মিলে এমন স্বাতন্ত্র্য খোঁজা বালখিল্য। তবু স্পষ্ট অনুভূতি জাগে, কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছেন- বাচিক অভিনয়ে বিশেষ করে। পুরো নাটকের কথোপকথন, যেন এটা সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মত আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শম্ভুবাবুর নিজের উদ্দাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুদ্ধপর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র আনে, গান জমিয়ে দেওয়া কঠিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও এই সুরের আর গদ্যছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী; এখানেই বিশেষ করে তারা খাঁটি বাঙালী। অন্যপক্ষে ইউরোপীয় মঞ্চে প্রোসেনিয়মের অভ্যন্তরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শম্ভু মিত্র।[৩৫]

যক্ষপুরীর জাদু মহল বাংলাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছিল ২০শে মার্চ ১৯৫৭ সালে নিউ পিকচার হাউসে কলকাতার 'বহুরূপী' নাট্যদল 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয় করে। দুই বাংলার প্রাণেই সমানভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা ঢাকা শহরের বিশেষ কিছু পত্রিকায়

প্রকাশিত ‘রক্তকরবী’ নাটকের সমালোচনা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখব এই বাংলার মতো ওপার বাংলাতেও ‘রক্তকরবী’ নাট্যমোদীদের মনে সমানভাবে ঢেউ তুলেছিল। যে রবীন্দ্রনাথকে মানুষ কেবল ঘরে বসে পড়ার বাইরে নাট্যমঞ্চে কল্পনা করা অস্বাভাবিক বলে মনে করতেন, কলকাতার ‘বহুরূপী’ নাট্যদল সেই জায়গাটা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, শম্ভু মিত্রকে তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমালোচকেরা মন্তব্য করেছেন-

> অভিনয়ের তুলনায় মঞ্চ কৌশলে অধিক দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে, মঞ্চ পরিচালনা ও আলোকসজ্জাতে যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মঞ্চে রূপায়িত যক্ষপুরীর পরিবেশ এদেশের মঞ্চের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন।[৩৬]

> অপূর্ব সফলতার সঙ্গে পরিবেশিত নাটকটি দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছে। ঢাকার মঞ্চে এই শ্রেণীর উচ্চ স্তরের অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটক ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই বলিয়া অনেকে মন্তব্য করেন। এমন একটি দূরহ শিল্পধর্মী নাটকের সার্থক রূপায়ণ বহুরূপীর কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে।[৩৭]

> ...বহুরূপীর রক্তকরবী দেখার আগে আমরাও ভাবতে পারিনি যে, রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকের এমন সার্থক মঞ্চ রূপায়ণ সম্ভব। নাটকটি প্রতিটি দর্শকের মনকে নাড়া দিয়েছে, প্রতিটি দর্শককে অভিভূত করেছে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাটক পরিবেশন করে দর্শক মন জয় করা সম্ভব হল কিভাবে, নাটকটির তো কোথাও কোন পরিবর্তন করা হয়নি। সংলাপ যথাযথই রাখা হয়েছে। তাসত্ত্বেও পাত্র-পাত্রীর কোন কথাই তো হেঁয়ালি মনে হয়নি। ‘রক্তকরবী’ মাধ্যমে যে ভাবটি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, অন্তত নাটক পড়ে যা বুঝেছি তাও তো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কাহিনীর যে শিথিল বন্ধন রবীন্দ্র নাটকের ত্রুটি বলে উল্লেখ করা হয় ‘বহুরূপী’র রক্তকরবীতে সে ত্রুটি চোখেই পড়েনি।[৩৮]

তবে একথা সত্য যে কেবল মঞ্চসজ্জার মুগ্ধ হলে অভিনয়ের রসাস্বাদনে খামতি পড়ে শুধু মঞ্চ বা টেকনিশিয়ানের সামনে নয় অভিনয় পারদর্শিতাও সমান ভাবে দাবি রাখে। তাও এই মঞ্চ তো কম সমালোচিত হয়নি। উৎপল দত্ত তাঁর সমালোচনায় মঞ্চ সম্বন্ধে বলেছেন -

> আবার চলাফেরা শুধু ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে নয়সমতল সিঁড়ির সাহায্যে, একাধিক প্লেনে বিভক্ত করে উচ্চ নীচ কম্পোজিশন ও আধুনিক নাটকে অপরিহার্য। অথচ বহুরূপীর প্রযোজনায় মঞ্চের একাধারে সিঁড়ির ধাপ অবহেলিত হয়েই রইল বড়োজোড়, ব্যবহৃত হল কয়েকটি নেহাৎ প্রবেশ বা প্রস্থানের প্রয়োজনে। আবার মঞ্চের এক কোণে শ্রমিকদের ভীড়, অন্যদিকে শোচনীয়ভাবে ফাঁকাভারসাম্যের- এমন অভাবও থেকে থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।...অথচ কথার সুরঝংকার বহুল বিস্তারে কী শক্তিশালী, কী ললিত রূপই না দেয়া যেত দশধাপের এক বৃহৎ আড়াআড়ি সিড়িঁর সাহায্যে।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কপিরাইট বিষয়ে শম্ভুবাবু জানাচ্ছেন যে ১৯৫৪ সালে ‘রক্তকরবী’ নাটকের জন্য অনুমতি নিতে ও দক্ষিণা দিতে রাজি হওয়ার পরেও নাটকটি দুবার মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই অনুমতি নাকচ করতে চাওয়া হয় কেননা, তাদের দাবি ছিল আমরা নাকি ওই নাটকের কদর্য করে অভিনয় করেছি।[৪০]

তথাকথিত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের কুক্ষিগত রবীন্দ্রনাথকে শম্ভু মিত্র করে তুলেছিলেন সর্বসাধারণের করে। ‘রক্তকরবী’-র মঞ্চায়িত রূপ দেখে দর্শকমন্ডলী মুগ্ধ হলেও বিশেষ করে সমালোচকমণ্ডলী রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক ‘রক্তকরবী’ দেখে কেবল মুগ্ধই হননি সঙ্গে ছিল তাদের অজস্র প্রশ্নের সম্ভার। এই সৃষ্টিকে মানুষ মেনে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিনা প্রশ্নে নয়, তার জন্য আসরে আবারও নিজেকে প্রমাণ দিতে বা বলা যায় নিজের কাজকে লোকের কাছে আরো পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল, যা অসম্মানজনক হলেও সব প্রশ্নের উত্তরই শম্ভু মিত্র দিয়েছিলেন, কারণ তিনিই একমাত্র এর উত্তর দিতে পারতেন। প্রশ্ন তো দর্শকমনে আসতেই পারে, যে বুদ্ধি দিয়ে আমরা দর্শকরা নাটক দেখতে যাই আর যে বুদ্ধি দিয়ে নির্মাতা নাটক নির্মাণ করেন তা তো কখনই এক হতে পারে না। প্রায় প্রতিটি সমালোচকই কম-বেশি মঞ্চসজ্জা, পোশাক-আশাক, বাচনভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শম্ভুবাবুকে, ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, এসবের প্রত্যুত্তর অতি অবশ্যই দরকার ছিল।

রক্তকরবী নাটক আমরা কী ভেবে অভিনয় করেছি অর্থাৎ একই কী উদ্দেশ্যে ঐ রকম দৃশ্যসজ্জা করেছি, ঐ রকম পোষাকাদি পরেছি, ঐ রকমভাবে কথাগুলো বলেছি - এইটা জানবার অনেকেরই কৌতুহল। রবীন্দ্রনাথের যে ভাষায় রক্তকরবী লেখা সে ভাষা বলতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল অথচ চার অধ্যায়ের ভাষা বলতে আমাদের এ রকম অসুবিধা হয়নি কিন্তু এতে হঠাৎ মনে হয় ভাষাটা বেশি কাব্য নয় প্রথমত তাদের বক্তব্য সত্যের উজ্জ্বল্য কমে যায়, দ্বিতীয়ত সব চরিত্র একরকম জাতের নয় তাহলে? কিছু লোক সুরে বলবে আর কিছু লোক প্রাকৃত ঢঙে বলবে? সেটা আমাদের ভালো লাগলো না। কারণ তাহলে যে চরিত্রগুলো সুরে বলবে লোকে মনে করবে তারা ঢং করছে তাদের কথার কোন দাম দেবে না।... এই সমস্ত কথা মনে হওয়ার জন্যই আমরা কথা বলার ধরণটা পালটালাম। শহুরে কথাবার্তার মধ্যে একটা inhibition আছে একটা দেওয়াল আছে। কিন্তু এই সমস্ত সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলা যা বলে তা পুরো হৃদয় দিয়ে বলে। দরাজ দিল, দরাজ স্নেহ, দরাজ গলা বলে বোঝাতে পারলাম কিনা জানিনা, তবে আমরা চেষ্টা করেছি সৎভাবে মন খুলে বলতে। তাতেই কাব্যিক না হয়ে, ন্যাকামি না করে, সত্য কাব্য ফুটতে পারে...অবশ্য, একথা স্বীকার করি যে যতোটা সুন্দর করে আমরা কথাগুলো বলব ভাবি এখনও সুন্দর করে বলতে পারি না। তবে, কাব্যিক মনোভাবের ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে লোক যখন রক্তকরবীর মধ্যে জীয়ন্ত মানবিক হাসি, ঠাট্টা, দুঃখ দেখতে পাচ্ছিল না, বহুরূপী তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে চোখ খুলে দেখছে বলে সেইগুলো কিছুটা দেখতে পেয়েছে। আরও বুদ্ধি থাকলে আরো পারতো।[৪১]

যে নাটকের পাঠ ছিল কেবল বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ, তা যখন মঞ্চস্থ করে দর্শক-মনে পৌঁছে দেওয়া হল, গড়ে উঠল নতুন ইতিহাস। জাতীয় নাট্যানুষ্ঠানে বাংলার নাট্যদল 'বহুরূপী'-র 'রক্তকরবী' যেমন নাট্য ইতিহাসের মুখোজ্জ্বল করেছিল সেই সঙ্গে ছিল বাংলা থেকে অন্য কোনো নাট্যদল অংশগ্রহণ না করার আক্ষেপ। *রূপমঞ্চ*[৪২] পত্রিকার লাইনগুলির দিকে তাকালে সে সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। 'বহুরূপী'-র প্রযোজনা দেখে তারা মুগ্ধ অভিভূত হয়ে লিখছেন-

...ভাষাগত বাধা গ্রহণে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি তাই প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব বহুরূপীর এই গৌরব কেবলমাত্র পুরস্কার প্রাপ্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বাংলা থেকে অন্য কোন নাট্য সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেননি পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

এই নিষ্ক্রিয়তা বেদনাদায়ক আশা করি ভবিষ্যতেও প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে যোগদান করে শিল্পের পরিচয় দিতে তৎপর থাকবেন এবং বর্তমানের অমার্জনীয় অপরাধ করার সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করবেন না।[৪২]

এ পর্যন্ত আলোচনায় মনে হতে পারে, আমরা 'বহুরূপী'-র 'রক্তকরবী' প্রযোজনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলি নিয়ে ততটা আলোচনা করলাম না। স্বয়ং শম্ভু মিত্র তাঁর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে আকাশবাণীতে পর্বে পর্বে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তার একটিতে শ্রী বিভাস চক্রবর্তী 'রক্তকরবী' থেকে কথা শুরু করতে চাইলে শ্রী মিত্র বিরক্ত হন।[৪৩]

আমাদের যুক্তি এই যে, 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার' নিয়ে কোনো বিতর্ক হয় নি, বরং সব মহলেই নাটকগুলি আদৃত হয়েছে। খুবই বিতর্ক হয়েছিল 'চার অধ্যায়' নিয়ে, কিন্তু সে বিতর্ক ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটি প্রকাশের সময় থেকেই শুরু হয়। গণনাট্য ছেড়ে আসার পর থেকেই শম্ভু মিত্রের রাজনৈতিক অবস্থান প্রশ্নের মুখে পড়েছে, 'চার অধ্যায়' প্রযোজনার দরুন সেই প্রশ্ন কিংবা আক্রমণ বহুগুণ বেড়েছে-যার সঙ্গে নাট্যের প্রযোজনাগত সম্পর্ক নেই বললেই চলে। প্রযোজনাগতভাবে বরং 'চার অধ্যায়' -কে কেউ কেউ 'বহুরূপী'র শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বলে মনে করেছেন।[৪৪] প্রসঙ্গত আমরা মনে রাখতে পারি, নানা পর্যায়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর (১৯৫২ থেকে ১৯৮২) শ্রী মিত্র শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে 'চার অধ্যায়' অভিনয় করেছেন।

সমালোচিত হয়েছে 'পুতুল খেলা'। এই নাটকের অভিনয়ে, বাংলা রূপান্তরে অনেক গলদ দেখতে পেয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়,[৪৫] ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই নাটক বাংলা ভাষায় অভিনীত হলেও বাঙালিয়ানার একান্ত অভাব লক্ষ করেছেন।[৪৬] বিপরীতে পূর্ণেন্দু পত্রী ঠিক উল্টো মতই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ...নাট্যকার যে দেশেরই বাসিন্দা হোন, 'পুতুল খেলা'র সমস্যাটি এদেশের মাটিতেও ডালপালা ছড়িয়ে আজ ক্রমশ আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে।[৪৭] দিল্লির *Arts and Events* পত্রিকাতেও ১৯৬১

সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে 'রক্তকরবী', 'বিসর্জন', 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকের সঙ্গে অভিনীত 'পুতুল খেলা'-র অভিনয় দেখে এর বাংলা রূপান্তরের প্রশংসা করা হয়েছে।[৪৮] মনে রাখতে হবে, 'বহুরূপী'-র আগেই, ১৯৫৩ সাল নাগাদ উৎপল দত্ত পরিচালিত 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)-এর এই নাটকের রূপান্তর অভিনয় করেছিলেন 'পুতুলের সংসার' নামে, তাঁদের প্রথম অভিনয়ও হয়েছিল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে।[৪৯] এই সময়ে তাঁরা 'অচলায়তন' ও করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে, আমাদের তৃতীয় প্লে-ই ছিল *অচলায়তন*।[৫০] যতদূর জানা যায়, সে অভিনয় হয়েছিল অসফল। দাদাঠাকুরকে নির্দেশক উৎপল দত্ত সাদা প্যান্ট সাদা জহরকোট পরিয়ে বুকে লাল গোলাপ পরিয়ে এক স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিমায় নিয়ে এসেছিলেন-যা দর্শক গ্রহণ করতে পারে নি। করবু নি করবু নি, রবীন্দ্রনাথের নাটক আর করবু নি...উৎপল দত্তের এই প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি ঠিক কবেকার জানা নেই আমাদের, কিন্তু ১৯৫৭ সালে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' অভিনয় করেছেন। নাটকটির বেশ কিছু অভিনয় হয়েছিল।[৫১] সেই 'তপতী' অভিনয়ের একটি বিবরণী জানা যায় শঙ্খ ঘোষের জবানবন্দীতে-

> উৎপল দত্ত বা তাঁর নাট্য-অভিজ্ঞতা অনেকটাই তখন খ্যাতি অর্জন করেছে। তাই ওইরকম একটা জবরদস্ত দলের রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে-এই কৌতূহল নিয়ে রঙমহলে গিয়েছিলাম। একেবারে একা। কিন্তু এতটা হতাশ হয়ে ফিরেছিলাম আজ যা প্রায় অবিশ্বাস্য লাগে।[৫২]

এর কিছুদিন আগে শঙ্খ ঘোষের প্রথম নাট্যবিষয়ক লেখা 'বহুরূপী'-র 'রক্তকরবী' বিষয়ে 'বহুরূপী'-তে পড়া হয়েছে, কুমার রায় সে চিঠির প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, এবং মে ১৯৫৫ থেকে প্রকাশমান 'বহুরূপী' পত্রিকায় তাঁকে লেখক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে, যিনি পরবর্তীকালে *বহুরূপী* ও *পরিচয়* পত্রিকা ছাড়াও *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার 'Our drama critic'[৫৩] হিসাবে নাট্যসমালোচনা করলেন দশ বছর-তিনিও ১৯৬১ সালে 'বহুরূপী'-র 'বিসর্জন' দেখে হতাশ হয়ে তাঁর বন্ধু

কালীপ্রসাদ ঘোষকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আপত্তির জায়গাগুলি জানান। কালীপ্রসাদ শমীকবাবুর নির্দেশ না মেনে চিঠিটি দলে পড়ার ব্যবস্থা করেন এবং গঙ্গাপদ বসু (১৯১০-৭১) চিঠি লিখে, তাঁর সব যুক্তির সঙ্গে একমত না হওয়া সত্ত্বেও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে *বহুরূপী* পত্রিকায় নিয়মিত থিয়েটার বিষয়ে লেখবার আমন্ত্রণ জানান।

আমরা 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' - এর 'পুতুলের সংসার' অভিনয়ের কথা আ গেই বলেছি। সদ্য তখন উৎপল দত্ত ইংরেজি থিয়েটার ছেড়ে বাংলা থিয়েটারে এসেছেন। ইবসেনের যে দুটি নাটক তাঁরা করেছিলেন,[৫৪] দুটিই ছিল অনুবাদ, বাংলা রূপান্তর নয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন-

> এবং একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে শেষ দশকে পোশাক আশাক, মঞ্চসজ্জা, নরওয়ে-তে যা ছিল সেইটাকে অত্যন্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আনবার চেষ্টা করেছেন। ...এইজন্যেই যে ডলস হাউস-এ যেটা ঘটছে...ঠিক সেইভাবে ১৯৫০-এর দশকে কলকাতা শহরে সেটা ঘটে না।[৫৫]

অরূপ মুখোপাধ্যায়ের তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে,[৫৬] 'পুতুলের সংসার' 'এল টি জি' দুবার করেছিলেন, একবার ১৪/০৯/১৯৫১-য় আর একবার 'সাংবাদিক'[৫৭] নাটকের (কনস্তান্তিন সিমনভের 'দ্য রাশিয়ান কোয়েশ্চেন' অনুবাদ সরোজ দত্ত, ০৬/১২/১৯৫২) পর ০৭/০৩/১৯৫৩ তে। তখন বাংলায় নামকরণের সূত্র পাওয়া যায় *দ্য স্টেটসম্যান* -এর রিভিউতে।[৫৮] নোরা হয়েছিল নীরজা, ড. ফ্র্যাঙ্ক হয় ড. রায়, মিসেস লিন্ডে লতিকা, নিলস ক্রোগস্টাড হল নীলরতন চক্রবর্তী। নোরার স্বামী টরভাল্টের বাংলা নাম জানা যায় নি।

শ্রী দত্ত তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পরবর্তী সময়ে 'আই পি টি এ' ইত্যাদি পর্ব পেরিয়ে একটি দুটি নাটকের[৫৮] পর যখন তাঁরা মির্নাভায় আসছেন, মনে হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলন আনতে হবে। পেশাদার নাট্যশালায়...কিন্তু সেইসঙ্গে স্টেজ-এ আসবে এমন দৃশ্যসজ্জা, আলো, এমন চমক যাতে দর্শক তৃপ্ত হয়।[৫৭]

সকলেই জানেন, 'এল টি জি' গ্রুপ এবং উৎপল দত্তের নাট্যজীবনে 'অঙ্গার' একটি দিক্‌চিহ্ন নির্ণয় করেছিল। (প্রথম মঞ্চায়ন ৩১/১২/১৯৫৯, মুখোপাধ্যায়, 2011, পৃ 295)। কিন্তু এই নাটকের আগেই শ্রমজীবী মানুষকে কীভাবে থিয়েটারে আনবেন, সে চেষ্টা তিনি রবীন্দ্রনাটকে করেছিলেন এবং তাই নিয়ে বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল। নাটকটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা'[৫৮]। অভিনয়টি দেখে *স্বাধীনতা* পত্রিকার জনৈক কমলা দেবী একটি চিঠি লেখেন 'পাঠকের কলমে'। 'লিটল থিয়েটারের বক্তব্য' নামে তার দীর্ঘ উত্তর দেন উৎপল দত্ত।[৫৯] 'পাঠকের কলম' শিরোনামে লেখা হয়- রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' প্রযোজনা সম্পর্কে ('লিটল থিয়েটার'-এর 'কালের যাত্রা'-র প্রযোজনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ সম্পর্কে আমরা একখানি চিঠি ও তার সঙ্গে প্রযোজনা সম্পর্কে প্রযোজক উৎপল দত্তের বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করছি। আগামী ৩রা জুলাই *স্বাধীনতা*-র পাঠক ও দরদীগণ 'লিটল থিয়েটার'-এর 'কালের যাত্রা' দেখবার সুযোগ পাবেন। প্রযোজনা সম্পর্কে তাঁরাও যদি তাঁদের মতামত আমাদের জানান তা হলে এই কলমে তার আলোচনা চলতে পারবে) আর কোনো লেখা ছাপা হয়েছিল কিনা তার হদিশ আমরা জানি না, কিন্তু মূল লেখা দুটি পেয়েছি। 'দর্শকের চিঠি' শিরোনামে পাঠিকা দেখাতে চেয়েছিলেন, ১৯৩৪-৩৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন জেলবন্দী তখন অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে তপশিলী জাতির লোকেদের চাপে পুণা প্যাক্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অনশনরত গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে পুণা জেলে যান। সেই অবস্থায় কবির এই মূল বক্তব্যকে (অস্পৃশ্যতা বা এখনকার সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী 'দলিত') রাখিলেই কি ভালো হইত না-? ১৯৩৮-৩৯ সালে যখন কলিকাতায় উহা অভিনীত হয়, তখন তো এইভাবেই উহা অভিনীত হইয়াছিল...আজিকার দিনে ধরিত্রীর যে নিকটতম, যাহার হাতের স্পর্শে ফসল ফলে, আগুন জ্বলে, সেই অস্পৃশ্য শূদ্রই সংসার চক্রের চালক-তাহার হাতেই প্রকৃত শক্তি-অর্থাৎ তাহাকে আজ অস্পৃশ্য করিয়া রাখিবার উপায় নাই-এই কথাটাই কবি ভারতবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহেন।

সেদিন স্টেডিয়ামে যাহা দেখিলাম-তাহাতে ঠিক এই কথাটাই মূল বিষয়বস্তু হইয়া ফোটে নাই। যাহাদের হাতে রথ চলিল তাহারা আধুনিককালের মজুর শ্রমিক শ্রেণি, অস্পৃশ্য জাত মোটেও নহে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,

মজুরশ্রেণি তো প্রধানতঃ শূদ্র বর্ণ হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি বিষয়-বস্তুর আমূল বদল হইয়া যায় না? অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যে নাটক...ইহাতে আরোপ করিলে তাহা না হয় কবির নাটক, না হয় আধুনিক নাটক।

উক্ত 'সমালোচনা' (অর্থাৎ বিরূপতা/ নিন্দা, দ্র 'প্রস্তাবনা' অংশে আমাদের 'সমালোচনা' শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা)-র উত্তরে শ্রী দত্ত সবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট Allegory, Idea, Symbol ইত্যাদির তাৎপর্য আলোচনা করে আলোচ্য নাটক থেকে লাইন তুলে তুলে দেখান শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথার জন্য ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে-এবং সেই প্রথা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস পুঁজির ভাণ্ডার আর অস্ত্রশালা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলবে-এ ধরণের বাল্যখিল্য সমাজচেতনা "রক্তকরবীর" রচয়িতার ছিল না। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে 'অচলায়তন' নাটকের ব্যাখ্যাও তুলে এনে উৎপল দত্ত দেখান-যেখানে লিটল থিয়েটার তার প্রয়োগকৌশল ব্যবহার করে প্রতীকবাদ কাটাতে চেষ্টা করেছে, তা হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণের বেলায়।... এক অজ্ঞাত বিগত যুগের কাল্পনিক দেশের কাল্পনিক পাত্রপাত্রীর অবতারণা না করে কি রূপক সৃষ্টি করা যায় না? আমাদের সমাজ, বর্ত্তমানকাল থেকেই কি তার উপাদান আহরণ করা যায় না? এ মূলনীতির বশবর্ত্তী হয়েই আমরা চরিত্রগুলিকে নানা সামাজিক বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করতে প্রয়াস পেয়েছি।

উৎপল দত্তের সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের নাট্যজীবনে তাঁর মৌলিক নাট্যরচনা এবং বিদেশি নাটকের অনুবাদিত প্রযোজনা প্রায় তুল্যমূল্য। কোনো কোনো প্রযোজনায় তাঁর সাফল্য গগন বিস্তারি, কখনো কখনো সমালোচনার ঝড়ে তিনি বিধ্বস্ত। যে কোনো মহান মাপের শিল্পীর মধ্যেই নানা স্ববিরোধ কাজ করে, তাঁর মধ্যেও ছিল সেই স্ববিরোধ। কিন্তু প্রবলভাবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন বা আত্মসমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ নানাদিকে বিস্তারিত, থিয়েটারে নাটক লেখা, সংগঠন চালানো, পরিচালনা, অভিনয় ছাড়াও পঁচিশটি পথনাটক, যার মধ্যে অনেকগুলির অভিনয় নিজেই করিয়েছেন, দীর্ঘ সাতাশ বছরে একশ একাত্তরটি বাংলা ছবি, চুয়াত্তরেরও বেশি হিন্দি ছবি, তিনটি ইংরেজি ছবিতে অভিনয়, পাঁচটি বাংলা ছবি পরিচালনা, বেশ

কিছু যাত্রাপালা রচনা এবং পরিচালনা, এবং ষোলোটি প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা উৎপল দত্তকে নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমরা তাই এই অধ্যায়ের শেষে এইটকুই বলতে চাইব, গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে আটমাসের সংসর্গ ছিল তাঁর, উত্তরকালে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে গণনাট্যের নাটককে তিনি সমালোচনা করেছেন,[৬০] অসংখ্য স্ববিরোধী কাজ করে গেলেও থিয়েটারে তিনি 'পিপলস থিয়েটারে' বিশ্বাসী, এরউইন পিসকাটর (Garman Theatre Director, Erwin Piscator (1893-1966) এর ভাবশিষ্য, কলকাতায় ব্রেশ্‌ট্‌ সোসাইটি অব ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা, সেই সংস্থার মুখপত্র *এপিক থিয়েটার*-এর প্রধান সম্পাদক, তাঁর লেখা *চায়ের ধোঁয়া* (১৯৬৪, রূপা) নামক ডিসকোর্সের পরিচালকের মতোই আদ্যন্ত পেশাদার ও জনপ্রিয় থিয়েটারের পক্ষপাতিত্ব করেও যিনি থিয়েটারকে শ্রেণিবৈষম্য দূর করার কাজে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চান, শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার করতে চান থিয়েটারকে, তিনি যে ক্রমশ অবান্তর নাট্য সমালোচনার বিরোধিতা করবেন, তা একান্ত স্বাভাবিক। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন-

> নাট্যসমালোচনা উৎপলবাবু কোনোদিনই চান নি, উনি ডিসকোর্স চেয়েছিলেন। থিয়েটারের ভাষার মধ্য দিয়ে দর্শকেরা ওই অভিজ্ঞতাটাকে পাঠ করবেন এবং তার মধ্য দিয়ে ওই বিচারশীলতার স্তরে গিয়ে দাঁড়াবেন, ভাববেন, বিচার করবেন, সেই জায়গাতে কিন্তু যাওয়া যায় নি।[৬১]

এই কথা মনে রাখলেও আমরা দেখতে পাই, যে *The Statesman* পত্রিকা সম্পর্কে একসময়ে যে উৎপল দত্ত ছিলেন শ্রদ্ধাবনত, সেই পত্রিকার নাট্য সমালোচক ধরণী ঘোষের সঙ্গে তাঁর বারবার বিরোধ ঘটেছে, *দেশ* পত্রিকায় তাঁদের দুজনার পত্রযুদ্ধ চলেছে। যথাস্থানে আমরা তার উল্লেখ করব। 'ম্যাকবেথ' দুবারে সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করলেও সেই প্রযোজনা নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুবাদটি সমালোচিত হয়েছে। সমগ্র প্রযোজনাটি অত্যন্ত উচ্চকিত মনে হয়েছে অনেক সমালোচকের, বিশেষত ম্যাকবেথের ভূমিকায় উৎপল দত্তের কণ্ঠ বিকৃতির কথাও বলেছেন অনেকে, শোভা সেনের লেডি ম্যাকবেথ খুশি করতে পারেনি

সমালোচকদের। *স্টেটসম্যান*-এর সমালোচক এরপরেও বলেছেন- Utpal Dutta as Macbeth was nearly perfect but the charm of his voice, his fine nuances of expression were largely marred by his unaccountable effort at placing the accent on the first syllable or was it also to bring back something real "Elizabethan"? (7^{th} Nov 1954) কারোর মতে, 'ক্রুর, বর্বরোচিত পরিবেশে' নাটকটিকে বাঁধবার জন্য 'উচ্চ স্বরগ্রামে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

> কিন্তু এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রাহ্য নয়। কেননা, ম্যাকবেথও মানুষ, তার চরিত্র ও কার্য্যাবলীকে পরিস্ফূট করে তুলেছে ভয়াবহ ও বিয়োগান্ত... জীবনের বহু মুহূর্ত্ত, যেখানে যেখানে ম্যাকবেথ একান্তে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতি তাকাবার সুযোগ পেয়েছে; চারপাশে ভয়াবহ যা ঘটছে তাকে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছে। এই সূক্ষ্ম মুহূর্ত্তগুলি বাদ দিলে। মূল চরিত্রদুটির আলোছায়াকে উপলব্ধি করতে না পারলে 'ম্যাকবেথে'র ট্র্যাজেডিই ব্যর্থ হয়ে যায়।[৬২]

'এল টি জি'-র উচ্চকিত অভিনয় বিষয়ে উৎপল দত্তের নিজস্ব একটি অভিমত ছিল। ...আর আমাদের এই মিনার্ভা থিয়েটার। ওখানে থ্রো না করলে কেউ শুনতেই পাবে না।[৬৩] 'অঙ্গার' একাদিক্রমে তিনশো রজনী অভিনীত হয়েছে মিনার্ভা থিয়েটারে। পরে ফিরে আবার প্রায় একশো অভিনয় হয়েছে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) প্রযোজনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেও সেই কৃতিত্বকে 'প্রায় ষোলো আনা' বলেছিলেন। সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন –

> অঙ্গারের শেষ দৃশ্যটি ইলিউসান সৃষ্টির অভূতপূর্ব নিদর্শন হলেও নাটক ওর আগের দৃশ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ায় শেষের দৃশ্যটি স্ট্যাটিক রয়ে গেছে, নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি।[৬৪]

দর্পণ পত্রিকায় যখন নাটকটির শততম অভিনয় হয়, তখন সৌরসেন নামধারী সমালোচক 'লিটল থিয়েটার'-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শুধু আর্থিক সাফল্য নয়, তারা যেন নতুন বলিষ্ঠ নাটক এবং পুরোনো ক্লাসিক নাটক করেন। কিন্তু শত রজনীর স্মারক পত্রিকায় 'এল টি জি' কেন *দর্পণে* প্রকাশিত অঙ্গারের আলোচনার কেবল 'নিন্দাত্মক উক্তি'গুলি সংকলিত করেছিলেন[৬৫] সে

হদিশ আমাদের জানা নেই। ০৭/১২/১৯৬২ তারিখের *স্বাধীনতা* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে বিক্ষোভ হচ্ছে, বলা হচ্ছে এটি কম্যুনিস্টপন্থী নাটক। প্রতিবেদকের অনুমান ১৯৬২ সালে সীমান্ত এলাকা নিয়ে ভারত-চিন যুদ্ধে নাটকটিকে ভারত-বিরোধী বলে ভাবা হচ্ছে। নাটকটি দিল্লি ও বোম্বাইতে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, মিনার্ভাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির অশোক সেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী-পদস্থ কর্মচারি এবং ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশি অতিথিরা নাটকটি দেখেছেন। কেউ তো কখনো প্রকাশ করেন নি যে, এই নাটক নিছক কম্যুনিস্টধর্মী। তা যদি হতো নাট্য উন্নয়নের জন্য লিটল থিয়েটার গ্রুপ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য লাভ করতেন না।[৬৬]

বহুরূপী এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপের সুবাদে আমরা ইতোমধ্যেই গণনাট্য-নবনাট্য হয়ে গ্রুপ থিয়েটারের যুগে প্রবেশ করেছি। আমাদের মনে রাখতেই হবে যে নাট্যদলটির প্রতিষ্ঠাকালিন নাম ছিল 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়', পরে নাম হয় 'বহুরূপী'- কখনো, কোনদিন 'বহুরূপী একটি গ্রুপ থিয়েটার' এমন পরিচয় নাম ছিল না, ছিল 'নাট্যসম্প্রদায়'। অধ্যাপক পবিত্র সরকার অবশ্য 'বহুরূপী'-কেই প্রথম গ্রুপ থিয়েটার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি 'বহুরূপী'-র আগেই উৎপল দত্তের *অ্যামেরিটর শেকস্‌পিরিয়ানস* (১৯৪৭)- এর উল্লেখও করেছেন[৬৭]। প্রবন্ধকার শেখর সমাদ্দার তাঁর এক সাম্প্রতিক লেখায় বহুরূপীর পূর্ববর্তী নাট্যসংগঠনগুলির একটি লম্বা তালিকা দিয়েছেন[৬৮]। 'নবনাট্যম' (১৯৪৬), 'ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ' (১৯৪৬), 'শ্রীমঞ্চ' (১৯৪৭), 'নেতাজি নাট্যমন্দির' (১৯৪৭), 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (১৯৪৮), 'বৈশাখী' (১৯৪৮), 'মিলন মন্দির' (১৯৪৮), 'অভিযাত্রী' (১৯৪৮), 'নটশ্রী নিকেতন' (১৯৪৮), 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' (১৯৪৮), 'প্রান্তিকনবনাট্যসঙ্ঘ' (১৯৪৯), 'নাট্যচক্র' (১৯৪৯), 'কিউব' (১৯৪৯), 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৯৪৯), 'জুয়েলস ক্লাব' (১৯৫০), 'তরুণ সঙ্ঘ' (১৯৫০), 'উত্তর সারথি' (১৯৫০), 'আর্ট থিয়েটার' (১৯৫০), 'বহুরূপী' (১৯৫০)। অহীন্দ্র চৌধুরি যে সমান্তরাল নাট্যচর্চার কথা বলেছিলেন, তার

মধ্যে হয়তো এই তালিকাটি বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তালিকা নয়, আমরা দেখতে চাইছি শ্রী শম্ভু মিত্র ও তাঁর নাট্যোদ্যোগকে একটি 'কমিউন' একটা গোষ্ঠী হিসাবে দেখতে- যারা 'ভালো করে ভালো নাটক' করার সংকল্পে ব্রতী। এই ক্যাচলাইনটিই আমাদের মতে 'নবনাট্যে'র মূল সূত্র। যদিও আমরা মনে রাখছি যে, সৌমেন গুপ্ত নামের এক দর্শক তাঁর ইংরেজি লেখায় 'চার অধ্যায়' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে 'বহুরূপী'-কে the well-known leftist dramatic unit[৬৮] বলে উল্লেখ করেছিলেন। যাই হোক, শম্ভু মিত্র *নবান্ন* নাটকের পুনরাভিনয় দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন, টিকিট বিক্রির লভ্যাংশ দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। সেটা সম্ভব হয় নিদর্শকের স্বল্পতায়। শঙ্খ ঘোষও তাঁর দেখা 'ছেঁড়া তার'-এর অভিনয়ে দর্শকের অপ্রতুলতার কথা বলেছিলেন। এরই কাছাকাছি সময়ে ছবির কাজে শম্ভু মিত্রকে বোম্বে চলে যেতে হলেও সতীর্থদের উজ্জীবিত উদ্দীপিত করতে যে চিঠি লেখেন (যার উল্লেখ ইতোপূর্বেই করা হয়েছে), তার নানাবিধ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। একদিকে সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক ফিকির, অন্যদিকে গণনাট্য- দুই থেকে আলাদা একটা অবস্থান গড়ে তোলা, মূলধন কেবলমাত্র 'ভালো নাটক'- এই বিষয়টা প্রতিষ্ঠা করা বড়ো সহজ কাজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, পুরো বিষয়টাকে তিনি নিজেই 'আন্দোলন' নামে চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন- ...আমরা doomed হলে আন্দোলনও doome। শ্রী মিত্রের প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এই নতুন ভাব ও রীতির নাটকের খোঁজে তাঁর কী প্রবল ব্যাকুলতা, যে সুত্র ধরেই তাঁর ক্রমে রবীন্দ্রনাথ, সোফোক্লেস হয়ে ভারতীয় নাট্যের স্বপ্নে পৌঁছনো।

'নবনাট্য'কে তাহলে (অবশ্যই 'নবান্ন'- উত্তর গণনাট্যকে এর আওতার বাইরে রাখতে হচ্ছে) ব্যক্তির দক্ষতানির্ভর থিয়েটার থেকে সরে এক সামগ্রিক সমাজ ও সময় সংলগ্ন নাট্য অভিঘাত নির্মাণের ক্ষেত্র বলে মনে করা যেতে পারে। এখনো দুটো প্রশ্নের মীমাংসা বাকি রয়ে যাচ্ছে-

এক, এই 'থিয়েটারে পেশাদারিত্ব' কথাটার অর্থ কি অর্থবিহীন দক্ষতা অর্জন/ প্রদর্শন শুধু? দুই, 'গ্রুপ থিয়েটার' অভিধাটি এল কোথা থেকে?

প্রথমটির উত্তর আলাদা করে খোঁজা হয়নি তেমন করে। 'বহুরূপী' গোষ্ঠীতে প্রথম যুগে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার অভিনয় করেছিলেন, এঁরা শিশিরকুমারের থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু এই মঞ্চে তাঁরা অর্থ নিয়ে অভিনয় করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। যতদূর জানি 'বহুরূপী'-তে কেউই পূর্ণ সময়ের নাট্যকর্মী ছিলেন না, সকলেই কোথাও না কোথাও চাকরি/ ব্যবসা করতেন, একমাত্র শম্ভু মিত্রই কোনোদিন কোনো চাকরি করেন নি। পরবর্তীকালে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হয়েছেন, হয়েছেন ভিজিটিং ফেলো। খুবই চিত্তাকর্ষক একটি তথ্য এই যে উৎপল দত্ত যতই না কেন তাঁর *জপেনদা জপেন যা* গ্রন্থের প্রবন্ধ বা রম্যরচনায় গণনাট্যের নাটককে সমালোচনা করে থাকুন না কেন, জীবনের শেষদিকে দেওয়া দীর্ঘতম সাক্ষাৎকারে বলেছেন গণনাট্য আন্দোলন থেকেই তাঁর থিয়েটারের প্রেরণা। 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (একমাত্র যে দলটির নামের সঙ্গে 'গ্রুপ' কথাটি সংযুক্ত ছিল) পেশাদার ছিল না, ...দুটোর মধ্যে একটা জিনিস অভিনেতাকে দিতে হবে। হয় টাকা দিতে হবে, নয় তাকে একটা মতাদর্শ দিতে হবে। যদিও তিনি একটু পরেই বলেন যে হোলটাইমার ছাড়া থিয়েটার হয় না, বিপ্লবও হয় না, 'হোলটাইমার বিপ্লবী হচ্ছে লেনিনের গ্রেট আবিষ্কার'। যাই হোক, এটা বোঝা গেল, নাট্য আন্দোলনের গোড়ার যুগে পেশা নেশা এক ছিল না, ছিল একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অথবা রাজনীতি- সমাজ- শিল্প সচেতন একটি মতাদর্শ। পুর্বোক্ত সাক্ষাৎকার সূত্রেই শ্রী দত্ত বলছেন, পেশাদার হওয়া উচিত ছিল, হলে $L\ T\ G$ উঠে গিয়ে $P\ L\ T$ হত না, জানাচ্ছেন নাটকের প্রস্তুতিকালে সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল থেকে সারাদিনের রিহার্সালে যাবার সময়ে চাকরিবাকরি থেকে ছুটি নিতে হত, আবার এও বলছেন লিটল থিয়েটার যখন মতাদর্শগত ভিত্তি পেয়ে গেল তখন সে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে চলতে থাকল। তখন আর পেশাদার হওয়া না হওয়াটা অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। (পূর্বোক্ত, পৃ ২২) এবং সেই আদর্শ মুখ্যত দলপ্রধানের ব্যক্তিগত

দর্শন সঞ্জাত। এই মূল কথাটি মনে রেখেই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে নির্বাচিত প্রযোজনার সমালোচনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবেশ করব।

উৎস ও টীকা

১) সেহানবীশ, চিন্মোহন, নভেম্বর ১৯৬০, *৪৬ নং, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশনস।

২) 'জবানবন্দী'র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে 'নবান্ন' নাটক লিখতে বসলাম। দ্র, ভট্টাচার্য, বিজন, ভূমিকা, ১৯১৯ জানুয়ারি, *নবান্ন* , প্রমা প্রকাশনী।

৩) সেন, শোভা, ১৯৯৩, 'স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ', এম সি সরকার, পৃ ১৮।

৪) ঘটক, ঋত্বিক, ১৯৭৮, 'বিজন ভট্টাচার্যঃ জীবনের সূত্রধার', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বিজন ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা, সংস্কৃতি সংসদ স্মারকপত্র, মুখোপাধ্যায়, তপতী (সম্পা)। লেখাটি *নাট্য দর্পণ*, ১৯৭৫, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৫) কবি বিষ্ণু দে-র এই লেখাটি সংগৃহীত হয়েছে *বহুরূপী* ৩৪, জুন ১৯৭০, নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন), চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ ৩২-৩৪।

৬) পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩।

৭) ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, অক্টোবর ১৯৬৯, 'তিনটি নাটিকা ও নবান্নের প্রথম স্মারণিক', *বহুরূপী* ৩৩, স্ব-সম্পাদিত, পৃ নব্বই।

৮) হালদার, রঙ্গীন, শ্রাবণ ১৩৫১, ১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, *পরিচয়,* 'বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা', প্রবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে অক্টোবর ১৯৬৯, *বহুরূপী* ৩৩, থেকে, নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ ৯৪-৯৫।

৯) "পরিচয়ে যুক্ত হই কিন্তু সম্পূর্ণটাই 'স্বাধীনতা'র সূত্র ধরে"। দ্রষ্টব্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, *থিয়েটারের জলহাওয়ায়,* সমাদ্দার শেখর, মিলি (সম্পা), প্যাপিরাস, পৃ ৩০।

১০) A Play about the peasantry, October 8th, 1944, *Amrita Bazar Patrika*, দ্র অক্টোবর ১৯৬৯, *বহুরূপী* ৩৩, নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ ৩৫।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক, 'ভারতের মর্মবাণী', প্রবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে অক্টোবর ১৯৬৯, *বহুরূপী* ৩৩, থেকে, নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ একশ উনিশ-কুড়ি।

১২) মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *নবান্নের আগে,* অক্টোবর ১৯৬৯, *বহুরূপী* ৩৩, থেকে, নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা), পৃ একশো চল্লিশ।

১৩) গোড়া থেকে শুরু করে গণনাট্যের কর্মকাণ্ডের চমৎকার বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, আগস্ট ১৯৯৭, *বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ, গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র,* পরিবেশক পুস্তক বিপণি, পৃ ৩৬-৬০।

১৪) পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬।

১৫) মজুমদার, স্বপন, ১মে ১৯৮৮, *বহুরূপী* (১৯৪৮-১৯৮৮), বহুরূপী প্রকাশনা, পৃ ১২।

১৬) পূর্বোক্ত, পৃ ১২।

১৭) চট্টোপাধ্যায়, নির্মল, জুন ২০০২, 'বহুরূপীর দিনগুলি', *নাট্যপত্র ঘরে বাইরে*, শেখর সমাদ্দার (সম্পা), পৃ ১৫৬।

১৮) দ্রষ্টব্য *বহুরূপী* ১৩৪, মে ২০২৪, ভৌমিক, অংশুমান (সম্পা)।

১৯) মিত্র, শম্ভু, জানুয়ারি ২০১৪, 'সমস্যার একটা দিক', *রচনা সমগ্র ১*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ১২৬-১২৮।

২০) পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য, 'আন্দোলনের প্রয়োজনে', পৃ ১২৯-১৩৯।

২১) চৌধুরি, অহীন্দ্র, মহালয়া, ১৩৬৬, *বাঙালির নাট্যচর্চা*, শঙ্কর প্রকাশন, পৃ ৫২-৫৩।

২২) পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩-৫৪।

২৩) সেনগুপ্ত, শচীন, 'বহুরূপীর উলুখাগড়া', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫ অক্টোবর ১৯৫০, দ্র *বহুরূপী* ৬৯, মে, ১৯৮৮, কুমার রায় (সম্পা), পৃ ৪৯।

২৪) পূর্বোক্ত, পৃ ৭০-৭৫।

২৫) সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০১৮।

২৬) পূর্বোক্ত, পৃ ১১৯-১৩৪।

২৭) হালদার অরুণা, *মুখপত্র*, শ্রাবণ ১৩৬১, 'রক্তকরবী'।

২৮) সান্যাল, হিরণ কুমার, *পরিচয়*, শ্রাবণ ১৩৬১, 'বহুরূপীর রক্তকরবী'।

২৯) 'বহুরূপীর রক্তকরবী', *আনন্দবাজার*, ১৩ জুলাই ১৯৫৪, দ্র-নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার ১৯৪৪-১৯৭৮ (প্রথম পর্যায়), *সংস্কৃতি*, তৃতীয় বার্ষিকী সংখ্যা, আগস্ট ২০০০, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), পৃ-১৯।

৩০) *The statesman*, 22 december 1954, 'Fine Production of Tagore's play'

৩১) হালদার অরুণা, *মুখপত্র*, শ্রাবণ ১৩৬১, 'রক্তকরবী'। দ্র পূর্বোক্ত, পৃ ২৫।

৩২) সান্যাল, হিরণ কুমার, *পরিচয়*, শ্রাবণ ১৩৬১, 'বহুরূপীর রক্তকরবী'। দ্র ওই, পৃ ২৯।

৩৩) পূর্বোক্ত।

৩৪-৩৫) দত্ত, উৎপল, পাদপ্রদীপ, আশ্বিন ১৩৬৩, দ্র পূর্বোক্ত, পৃ ৪২।

৩৬) আজাদ, 'বহুরূপী সম্প্রদায়ের রক্তকরবী অভিনয়', ২১ মার্চ ১৯৫৭। দ্র- নাট্য সমালোচনার দর্পনে বাংলা থিয়েটার ১৯৪৪-১৯৭৮ (প্রথম পর্যায়), সংস্কৃতি, তৃতীয় বার্ষিকী সংখ্যা, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), পৃ ৪৩।

৩৭) সংবাদ, 'বহুরূপী অভিনীত রক্তকরবী', ২১ মার্চ ১৯৫৭। দ্র- ওই, পৃ ৪৩।

৩৮) ইত্তেকাফ, "বুলবুল চারুকলা কেন্দ্রের সাহাযার্থে বহুরূপীর 'রক্তকরবী'", ২৮ মার্চ ১৯৫৭। দ্র- ওই, পৃ ৪৪।

৩৯) দত্ত উৎপল, পাদপ্রদীপ, আশ্বিন ১৩৬৩, 'বহুরূপী ও রক্তকরবী', দ্র,ওই পৃ ৪৩।

৪০) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, 'জনসাধারণ ভালটা বেছে নেবে, মন্দটাকে বর্জন করবে'।

৪১) *বহুরূপী*, সংখ্যা ৬৯, ১ মে ১৯৮৮, 'রক্তকরবী প্রসঙ্গে', কুমার রায় (সম্পা), পৃ ১৫৯।

৪২) *রূপ-মঞ্চ*, চতুর্দশ বর্ষ, সংখ্যা- ৭-৮, পৌষ মাঘ ১৩৬১ ।

৪৩) ২৬/০৮/১৯৯৫, আকাশবাণীতে প্রচারিত সাক্ষাৎকার-অনুষ্ঠান।

৪৪) দ্র মজুমদার, স্বপন, *বহুরূপী* ৩৮, 'দশকের ব্যবধানে দশচক্র', মে, ১৯৭২, শম্ভু মিত্র (সম্পা)।

৪৫) রায়, অন্নদাশঙ্কর, (ডিসেম্বর ১৯৫৬), 'পুতুল খেলা'প্রসঙ্গে', *বহরূপী* ৩, দ্র *বহুরূপী* ৬৯, মে ১৯৮৮, বিশেষ প্রযোজনা সংখ্যা, কুমার রায় (সম্পা), পৃ ২২০।

৪৬) মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'পুতুল খেলা প্রসঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ ২২১।

৪৭) পত্রী, পূর্ণেন্দুশেখর, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৫, 'পুতুল খেলা প্রসঙ্গে', নতুন সাহিত্য, দ্র পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ২২৬-২৮।

৪৮) পূর্বোক্ত, পৃ ২৪০-৪২।

৪৯) দ্র উৎপল দত্তের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৮, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)। শমীক বন্দ্যোপাধায়ের সাক্ষাৎকার গ্রন্থ *থিয়েটারের জলহাওয়ায়* (ফেব্রুয়ারি ২০০৭, শেখর সমাদ্দার, মিলি সমাদ্দার (সম্পা), সুবাদে আমরা জানতে পাই, *পুতুলের সংসার* নাটকে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন, পৃ ৩২।

৫০) উৎপল দত্তের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৮, পার্থ বন্দ্যোপাধ্য (সম্পা)। 'অচলায়তন' প্রযোজনার

যেটুকু সুখ্যাতি তা মূলত সুচিত্রা মিত্র এবং দ্বিজেন চৌধুরীর যুগ্ম গান এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চক চরিত্র রূপায়ণের কারণে।

৫১) ওই, পৃ ১৮।

৫২) ঘোষ, শঙ্খ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, *থিয়েটারের কথা,* সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থ, দেবাশিস মজুমদার (গ্রন্থক) সুকৃতি লহরী (লিখিন সহযোগী), প্যাপিরাস, পৃ ৬৩।

৫৩) ৪৮ নং সূত্রে উল্লিখিত *থিয়েটারের জলহাওয়ায়,* পৃ ৪১-৪২।

৫৪) *গোস্টস্,* ২৬/১১/১৯৫০, নিউএম্পায়ার, *পুতুলের সংসার,* ১৪/০৯/১৯৫১, শ্রীরঙ্গম। (সংস্কৃতি সঙ্ঘ), দ্র, মুখোপাধ্যায়, অরূপ, *২০১১,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ ২৯০।

৫৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, *২০২২, থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা,* লালমাটি, পৃ ১২৮।

৫৬) দ্র মুখোপাধ্যায়, অরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০-২৯১। অভিনয়টি হয়েছিল সেন্ট টমাস হলে।

৫৭) পত্রিকার নাম জানা যাচ্ছে না, এমন একটি লেখায় স্বয়ং সরোজ দত্ত নাটকটির প্রশংসাসূচক রিভিউ করছেন এবং সময়োপযোগী এই নাটকের আরো প্রদর্শন হোক চাইছেন।

৫৮) যথাক্রমে *বিসর্জন* (২১/০৩/৫১), *অফিসার* (১৬/১২/৫১), *ম্যাকবেথ* (২৩/০৪/৫২) *সাংবাদিক* (০৬/১২/৫২) ইত্যাদি নাটক। এবং *ছায়ানট* (১০/১২/৫৮) অরূপ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, *ছায়ানট* হয়েছিল বিশ্বরূপায় (দ্র ৫৪ নং সূত্র, পৃ ২৯৫। কিন্তু উৎপল দত্ত তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, *এল টি জি* গ্রুপ মিনার্ভাতে আসার পর... Thursday-তে হত ওথেলো, Saturday, Sunday হত ছায়ানট। ছায়ানট সবেমাত্র জমতে শুরু করেছে, এই সময়ে আমরা চেঞ্জ করি।

দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা, ২০১৯, *উৎপল দত্তঃ একটি সাক্ষাৎকার,* লালমাটি, পৃ ১৮৮।

৫৭) *পূর্বোক্ত সূত্র*, পৃ ১৮৮, ১৯০।

৫৮) মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৯৫৫-তে অভিনীত এই নাটকে আধুনিক পোশাকে করা হয়েছিল (দ্র ৫৪ নং সূত্র, পৃ ২৯০)।

৫৯) দুটি লেখার তারিখ বা অন্যান্য বিবরণী পাওয়া যায় নি, কলকাতার নাট্যশোধ সংস্থানের সংগ্রহ থেকে পাওয়া।

৬০) *দ্র দত্ত, উৎপল, মে ১৯৮৪*, 'ধর্মতলার হ্যামলেট', 'বাবুই আর পৌষ', 'রবি ঠাকুরের মূর্তি' ইত্যাদি রচনা, *জপেন দা জপেন যা*, নাট্যভাবনা।

৬১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ২০২২, *থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা*, লালমাটি, পৃ ১২৮।

৬২) নাট্যশোধ সংস্থান সূত্রে প্রাপ্ত *স্বাধীনতা* পত্রিকার একটি তারিখ বিহীন রচনা।

৬৩) উৎপল দত্তের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়, পৃ ৩১, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)।

৬৪) *রূপ-মঞ্চ* পত্রিকা, আগাস্ট ১৯৬০।

৬৫) *দর্পণ*, 'চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ', ১৭/০৬/১৯৬০।

৬৬) *স্বাধীনতা*, ০৭/১২/১৯৬২।

৬৭) সরকার, পবিত্র, মার্চ ২০০৮, 'কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার', *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, দে'জ, পৃ ২৮৮।

৬৮) সমাদ্দার, শেখর, ডিসেম্বর ২০২৩, সংখ্যা ৫, *গ্রুপ থিয়েটারঃ একটি মিথ ও তার পঁচাত্তর বছর*, অন্য The Other, মলয় রক্ষিত (সম্পা), পৃ ৪৩।

৬৯) *বহুরূপী* ৬৯, পূর্বোক্ত, পৃ ১২১।

৭০) উৎপল দত্তের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়, পৃ ২২, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)।

তৃতীয় অধ্যায়

পাঁচ ও ছয়ের দশকের গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য সমালোচনা :

নির্বাচিত প্রযোজনার ভিত্তিতে

মতাদর্শ এবং গ্রুপ থিয়েটার ও তারপর

এই মতাদর্শের প্রশ্নেই ছয়ের দশকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও রাজনীতিতে নানান স্রোত প্রতিস্রোতের জন্ম। সেই অবস্থাটি চলে সাতের দশক পর্যন্ত। অসাধারণ সব যুগান্তকারী নাট্যনির্মাণের সময় এই দুই দশক, খালেদ চৌধুরি তাপস সেনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্যহীন শিল্পের সন্ধানে রত থেকেছে আমাদের নাট্য। পার্টির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীতেও অনিবার্যভাবে উঠেছে মতের তফাৎ, যেমন 'আমাদের থিয়েটার কতটুকু রাজনৈতিক', 'গ্রামে যাওয়া না যাওয়া' ইত্যাদি। 'থিয়েটার ওয়র্কশপ'- এর আয়োজনে এইসব আলোচনা/ বিতর্কসভার বিবরণী তাদের নাট্যপত্র 'থিয়েটার বুলেটিন' থেকে আজও সংগ্রহযোগ্য। কিন্তু এসবই সাতের দশকের ঘটনা। সঙ্ঘাতের ইতিহাস ছয়ের দশক জুড়ে। বলাই বাহুল্য, সেই সঙ্ঘাতে ব্যক্তিগত স্তর কম ছিল না কখনোই। ফলে, দুটি প্রবণতা বড়ো করে দেখা দেয় এই সময়ে। একদিকে কলকাতার নামী এবং প্রতিষ্ঠিত দলগুলিতে ভাঙন ধরছে, দল ভেঙে দল তৈরির প্রবণতা বাড়ছে। *বহুরূপী* পত্রে একদা অমর গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'দল গড়ার দায়িত্ব'[১] আর বিভাস চক্রবর্তী *দেশ* পত্রিকায় লিখছেন 'গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ'[২] এর মতো লেখায় দল ভাঙার কার্যকারণ, তাঁর সরস রচনাভঙ্গিতে।

ছয়ের দশকে পার্টি ভাঙল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন-

> দমদমে ইতিমধ্যে পার্টি নিয়ে খুব গণ্ডগোল আরম্ভ হল। আর আমার কিরকম একটা গরজ। হবেই, দিনরাত যদি আপনি একটা জিনিস নিয়ে লেগে থাকেন! আমি বুঝতে পারছি, পার্টি ভাঙবে। পার্টি মিটিঙে

বললাম, পার্টি ভাঙবে। বলল, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি কমরেড? কমুউনিস্ট পার্টি ভাঙবে? হুঁঃ!' আট মাস হল, পার্টি ভেঙে গেল।[৩]

ফলত রবীন্দ্র-কথিত 'মিছরির দানা'[৪]-র মতো, একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে লাগল এক একটি দল। শুরুতে একে 'নবনাট্য' বলা হচ্ছিল, এবং একে একটি আন্দোলন স্বরূপ দেখতে চাইছিলেন স্বয়ং শম্ভু মিত্র, যদিও তাঁরা 'গ্রুপ' নামে অভিহিত হতেন না, হতেন 'নাট্যসম্প্রদায়' নামে। ১৯৬০-এ প্রতিষ্ঠিত 'নান্দীকার' গোষ্ঠীও তাঁদের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটক দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, দমদম আই পি টি এ-র শাখা সংগঠন হিসেবে। কেবল 'লিট্‌ল্ থিয়েটার'-ই তাঁদের নামের মধ্যে 'গ্রুপ' কথাটি রেখেছিলেন, এবং রাজনৈতিক ভাবে যে দায়বদ্ধতা তাঁরা বহন করতেন, সেকথা আমরা শ্রী দত্তের সাক্ষাৎকার সুবাদে আগেই আলোচনা করেছি, এই অধ্যায়ে প্রযোজনা সূত্রে আরও দেখাব। পার্টির ভাঙনের পরে থিয়েটারের দলগুলিতেও ভাঙন আসে, 'বহুরূপী' থেকে জন্ম নেয় 'রূপকার', 'এল টি জি' হয়ে যায় 'পি এল টি', 'নান্দীকার' থেকে জন্ম নেয় 'থিয়েটার ওয়র্কশপ'। আর ঠিক এই সময়ে 'গ্রুপ থিয়েটার'-এই বাক্যবন্ধের জন্ম হল, এমন কি তাত্ত্বিক এবং ইতিহাসগত ভাবে তাকে সজ্ঞায়িত করার চেষ্টাও হল[৫]। এর অর্থ দাঁড়াল, যাদের একটি মূলত বামপন্থী অবস্থান আছে, কিন্তু শুধু রাজনীতি নয়, নাট্য শিল্পমানের দিকে ঝোঁক আছে, গণনাট্য নয়, ব্যবসায়িক নয়, যার কর্মীরা স্কুলে কলেজে অফিসে চাকরি বাকরি করে সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার করেন। অজিতেশের মতো কেউ কেউ আবার এই বাতাবরণ থেকে পেশাদার হতে চাইবেন, এবং এই পথ ধরে উত্তরকালে গ্রুপ থিয়েটার তার খোলস বদলে নেবে আরো পরে। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে একটি পত্রিকা বেরোবে, যার নামই 'গ্রুপ থিয়েটার'। অন্যদিকে, আমেরিকার 'গ্রুপ থিয়েটার' নামক একটি নাট্যপ্রয়াসের অনুসরণে গড়ে উঠছে ''গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন''। রাজনৈতিকভাবে এই দলগুলি কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার ঘনিষ্ঠ বা সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী, উৎপল দত্তের মতোই। আমরা যে দলগুলি নিয়ে, তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা

করব, তারা সকলে কম বেশি এই বাতাবরণেই নিজেদের শৈল্পিক ক্ষিদে মেটাবার চেষ্টা করেছেন, শম্ভু মিত্রের মতো কেউ কেউ এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতির জন্য সমালোচিতও হয়েছেন। দলগুলি ভাঙতে থাকল কিন্তু মতাদর্শগত কারণে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তি সংঘাতের দরুন। একটা কথা গোড়াতেই বলা দরকার, আমাদের এই কাজটি যেহেতু ইতিহাসগত পর্যবেক্ষণ নয়, তাই আমরা কেবল প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করব, এবং অবশ্যই সময়ের অনুক্রম লঙ্ঘন না করে। সঙ্গত কারণেই আমরা 'রক্তকরবী'-র পর 'বহুরূপী'-র নাট্য প্রযোজনাগুলি নিয়ে তেমন সমালোচনা উদ্ধার করিনি, কেননা ওই প্রযোজনার পর থেকে 'বহুরূপী'-র যাত্রা শুরু হয় সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির অন্বেষণের দিকে, কখনো কখনো, শঙ্খ ঘোষ যেমন তাঁদের 'দশচক্র' আলোচনায় (নাটকটি দুই পর্যায়ে অভিনীত, প্রথমবার ১/৬/১৯৫২-তে, নবপর্যায়ে ২৬/১০/১৯৬২-তে) বলেছেন-

> ...দশচক্র অভিনয়ের শেষ মুহূর্ত, অবরুদ্ধ বিপুল দর্পে শম্ভু মিত্রের সেই অভিমানী এগিয়ে যাবার ভঙ্গি... অন্ধকারকে দেখাবার আর তার থেকে বেরিয়ে আসবার কালোপযোগী স্বতন্ত্র একটা মাত্রা পেয়ে গেল সে।[৬]

শঙ্খবাবুর নাট্যবিষয়ক লেখালেখির সিংহভাগ জুড়ে আছে 'বহুরূপী'-র নাটক, তুলনায় একইকালে অভিনীত 'এল টি জি' এবং 'নান্দীকার'- এর নাটক বিষয়ে তিনি প্রায় কিছুই লিখছেন না, এ আমাদের অবাক করে। সেই তিনিও ব্যক্তির অন্ধত্ব এবং অন্ধকার থেকে মুক্তির ব্যঞ্জনায় ১৯৬৪-তে অভিনীত বহুরূপী-র দুই নাটক, 'দুটি অন্ধকারের নাটক' বলে সোফোক্লিসের 'রাজা অয়দিপাউস' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটককে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা মেনে নিতে পারেন নি, বলেছেন-

> সোফোক্লেসের নাটকে আছে আলোকের উন্মোচনে পরিত্রাণহীন এক ট্র্যাজেডি, আর রবীন্দ্রনাথ সুদর্শনাকে বিভ্রান্ত আলোর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আনেন কেবল আত্মত্রাণের পন্থা রচনার জন্যে, অবশেষে আত্মশুদ্ধির

আলোকে যার উত্তরণ। তাই 'ঈডিপাসে'-এ শম্ভু মিত্রের প্রচন্ড কণ্ঠক্ষেপের সঙ্গে 'রাজা'য় তৃপ্তি মিত্রের আর্তনাদ শেষ পর্যন্ত তুলনীয় নয়।[৭]

শঙ্খ ঘোষের এই সমালোচনা ছাড়াও যে 'রাজা' এবং 'রাজা অয়দিপাউস' বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখে পড়ে নি এমনটা নয়। *বহুরূপী* পত্রিকার সম্পাদক কুমার রায় ১৯৮৮-র মে এবং অক্টোবরে যথাক্রমে ৬৯, ৭০-দুটি বিশেষ সংখ্যায় 'বহুরূপী' প্রযোজনার যে বিস্তারিত সংকলন প্রকাশ করেন, সেখানে নাটকগুলি সম্পর্কে বিরূপ/ বাঁকা সমালোচনাগুলি একেবারেই সংকলিত হয় নি বলে মনে হয়। শঙ্খ ঘোষ 'রাজা অয়দিপাউস' নিয়ে তেমন কিছু না বললেও 'রাজা' সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছেন-

> মুঠো সত্যিই কোথাও শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে বহির্নাট্যে নয়, অন্তর্নাট্যে... শেষ পর্যন্ত সেই নাটক এবং কবিতাকে কোনো এক বিন্দুতে তাঁরা মিলিয়ে দিতে পারেন নি, রহস্য ও প্রকাশ্য এসে নাট্যপ্রবাহে একসঙ্গে বাঁধা পড়েনি।[৮]

যে চরিত্রায়নের জন্য 'বহুরূপী' বিখ্যাত, তার মধ্যে ত্রুটি দেখেছেন অনেকে। কাঞ্চীরাজের ভূমিকায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়কে শঙ্খবাবুর মনে হয়েছে রক্তকরবীর সর্দার সুলভ টিপিক্যালিটি, আবার *দর্শক* পত্রিকার সমালোচকের বিচারে অয়দিপাউসের তৃপ্তি মিত্রের রানী য়োকাস্তা এবং কালীপ্রসাদ ঘোষের ক্রিয়ন রীতিমতো সমালোচিত হয়েছে।[৯]

প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে 'অয়দিপাউস'- এর। *দর্পণ* পত্রিকা তো লিখেই দিয়েছে-

> 'নবান্ন', 'রক্তকরবী', 'ছেঁড়া তার' ও 'দশচক্রে'র বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউসে'র অমোঘ নিয়তি তাদের এই মানসিকতাকে, তাদের বাঁচার সংগ্রামকে দুর্বল করে দেয়, বহুরূপীর কাছ থেকে আমরা এ নাটক চাইনি।[১০]

প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন *পথিকৃৎ* পত্রিকার প্রতিবেদক, নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে এই নিয়তিবাদ-নির্ভর নাটক করা অর্থ একধরণের বিশ্বাসঘাতকতা, এ কথাই সমগ্র লেখায় বলে তাদের সিদ্ধান্ত এই-

> ছেঁড়া তার, পথিক, রক্তকরবী, পুতুলখেলা, দশচক্র-এর প্রযোজক গোষ্ঠী আজ যদি এভাবে পিছন দিকে চলতে আরম্ভ করেন-তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না।[১১]

সোফোক্লেসের মূল চরিত্রের তুলনায় শম্ভু মিত্রের অয়দিপাউসকে অনেক দুর্বল বলেও ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে। তবে কিছু সমালোচনা খানিক মধ্যপন্থী, যেমন *গন্ধর্ব* পত্রিকার সমালোচনায় বিষ্ণু বসু, শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের চরিত্রায়ণের ভালো এবং মন্দ দিক দুইই তুলে ধরেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেন- বহুরূপীর এ প্রযোজনা বাঙলাদেশের নাট্য ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং এর ফলে বাঙলা মঞ্চের ভৌগোলিক সীমা অনেক বেশি প্রসারিত হল...[১২] ইত্যাদি। অধ্যাপক সুনীল সেনও প্রায় একই কথা লিখেছেন-

> ...Sambhu Mitra, while adding a new-and glamorous-feather to his cap, has earned--ojur gratitude by introducing Greek Theatre into our theatre.[১৩]

এই দুই নাট্যের আগে-পরে 'বহুরূপী'র যে নাটকসমূহ, সর্বত্র ব্যক্তিই মাথা কুটেছে, যেমন ইবসেন অবলম্বনে 'পুতুলখেলা' (১০/০১/১৯৫৮), রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' (১১/১১/১৯৬১), বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'[১৪] (৭/৫/১৯৬৭), নীতিশ সেনের 'বর্বর বাঁশি' (৭/৫/১৯৬৯) অথবা 'পাগলা ঘোড়া' (২৮/২/১৯৭১)। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' (২২/৬/১৯৬৯) হিটলারের জার্মানী রাশিয়ায় আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ এবং যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য সমৃদ্ধ এই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন হিংমাশু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনাটিও চমৎকার হয়েছিল, কিন্তু নাটকটির খুব বেশি অভিনয়ের ইতিহাস নেই। পত্রপত্রিকায় নাটকটিকে

তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বলা হলেও এবং নাটককারের ইষৎ সমালোচনা করা হলেও প্রযোজনা এবং ‘বহুরূপী’-র তরুণ শিল্পী-অভিনেতাদের প্রশংসাই করা হয়েছে।[১৫]

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসে তা এই যে ‘বহুরূপী’-র প্রবাদপ্রতিম যে খ্যাতি, তা মূলত রবীন্দ্রনাথ এবং ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার জন্য। উৎপল দত্তও বলেছেন-

> কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাঁরা সত্যিই করতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন বহুরূপী। শম্ভু মিত্র। এবং তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা বুঝেছিলেন এবং তিনি একটা বিরাট কাজ করে দিয়ে গেছেন বাংলা নাটকে। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনয়যোগ্য, রবীন্দ্রনাথ যে থিয়েটারে একটা অত্যন্ত চমকপ্রদ সংযোজন সেইটে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।[১৬]

উক্ত সাক্ষাৎকারেই শ্রী দত্ত শম্ভু মিত্রের বিদেশি নাটক অনুবাদে আপত্তির কথা উল্লেখ করেও বলেন যে ‘বহুরূপী’ ‘ইদিপাস’ করায় তিনি অত্যন্ত প্রীত-

> শম্ভুবাবু একটা জিনিষ করতে পারতেন, যেটা ওঁর কাছ থেকে শিক্ষা করা উচিৎ-চমক দিতে হয় মাঝে মাঝে। সবটাই যে রিয়েলিস্টিক্যালী অভিনয় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। মাঝে মাঝে অত্যন্ত আনরিয়েলিস্টিক ব্যাপার ব্যবহার করেন উনি।[১৭]

‘বহুরূপী’ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতাব্রত দত্ত (১৯২৪-১৯৯৫) গড়ে তোলেন ‘রূপকার’ (১৯৫৫), তাঁর প্রয়াণের পর দলটি অস্তিত্বহীন, ‘শৌভনিক’ (১৯৫৭) দল ভাঙলেও নতুন দল হয়নি, প্রধানত ‘মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়’ কেন্দ্রিক সংগঠন, দক্ষিণ কলকাতার অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা রাসবিহারিতে অবস্থিত এই মঞ্চে প্রযোজিত হয়েছে ‘নান্দীকার’-এর ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’, ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জীর’-র মতো নাটক, কিন্তু মঞ্চটি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এখনো সঠিক নাট্যাভিনয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত। ‘গন্ধর্ব’ (১৯৫৭) ভেঙে পরে হয় ‘নক্ষত্র’ প্রাণপুরুষ শ্যামল ঘোষের প্রয়াণের পর দুটি দলই অস্তমিত। ‘সুন্দরম’ (আগে ছিল ঋতায়ন, ১৯৫৭) এখনো কাজ করছে,

দল ভেঙে উল্লেখযোগ্য কোনো নতুন দল হয়নি। 'থিয়েটার ইউনিট' (১৯৫৮) শেখর চট্টোপাধ্যায় (১৯২৪-১৯৯০) 'এল টি জি' ছেড়ে এসে তৈরি করেছিলেন, তাঁর প্রয়াণের পর অস্তিত্বহীন, 'চতুরঙ্গ' (১৯৫৮), 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৯৫৯) সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই, 'নান্দীকার' (১৯৬০) রীতিমতো সচল বৈচিত্র্যপূর্ণ দল, 'চলাচল' (১৯৬৬) রবি ঘোষ (১৯৩১-১৯৯৭) শ্যামল সেন (১৯৩৬-১৯৯৩) প্রমুখের সঙ্গে 'এল টি জি' ছেড়ে এসে তৈরি করেছিলেন, পরবর্তী কালে শ্রী সেনের ছেলে কৌশিক সেন তৈরি করেন 'স্বপ্নসন্ধানী'। 'নান্দীকার' ভেঙে হয় 'থিয়েটার ওয়র্কশপ' (১৯৬৬) তা ভেঙে 'অন্য থিয়েটার' (১৯৮৪) আবার 'নান্দীকার' ভেঙে 'নান্দীমুখ' যা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩)-এর দল এবং এখনো সক্রিয়, এর আরো একটি টুকরো হল 'নান্দীপট', 'থিয়েটার কমিউন' (১৯৭২) ভেঙে 'শূদ্রক' (১৯৭৭), তার থেকে 'সংস্তব'। 'চেতনা' (১৯৭২) থেকে অধুনা অস্তিত্ব বিহীন 'তৃতীয় সূত্র'। 'বহুরূপী' থেকে 'চেনামুখ' (১৯৮১) এখন যা নেই, এবং 'পঞ্চম বৈদিক' (১৯৮৫) এখনো বিদ্যমান।[১৮]

প্রধান এই দলগুলির পাশাপাশি নিশ্চয় উল্লেখ করতে হয় 'থিয়েট্রন', 'গান্ধার', 'গণকৃষ্টি' প্রভৃতি নাট্যদলের কথা। নয়ের দশকের শেষ থেকে কলকাতায় নতুন দলের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, যা আরো অনেকগুণ বেড়ে গেছে নতুন শতাব্দীতে। জেলা মফস্বলেও সাতের দশকে, বিশেষত ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর লক্ষণীয় রকম বৃদ্ধি পায় নাট্যদলের সংখ্যা।

এল টি জি

'এল টি জি'-র 'ফেরারি ফৌজ' প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৮ মে ১৯৬১ মিনার্ভা থিয়েটার।[১৯] *যুগান্তর* (৩০-৬-৬১), *আনন্দবাজার পত্রিকা* (৩০-৬-৬১), *অমৃত* (২৩-৬-৬১), *চিত্রাকাশ* (২৭-১০-৬১) প্রভৃতি পত্রিকায় এই নাটকের সবিস্তার সমালোচনা বেরিয়েছে। সকলেই নাটকটিতে

লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের দলগত অভিনয়, যা ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল, তার এবং হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নীলিমা দাসের অভিনয়ের প্রশংসা করেছে, অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে মঞ্চে দোতলা সেট ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির, কিন্তু তারা প্রধান চরিত্র নীলমণি ওরফে শান্তি রায় চরিত্র এবং তাতে উৎপল দত্তের অভিনয়ের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব পেয়েছেন, নাট্যকাহিনি ও গঠনেও নানা দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'চিত্রাকাশ'-এর লেখাটিকে কিছুটা একালের মতো লিট্ল্ থিয়েটার-এর পক্ষ নিয়েই লেখা বলা যেতে পারে। 'কলকাতার পেশাদারী নাট্যমঞ্চকে লিটল থিয়েটার গ্রুপ সমৃদ্ধ করছে'-এই শিরোনামে লেখাটিতে বলা হয়-

> আজকের কোলকাতার পেশাদারী মঞ্চে যে পাঁচটি নাটক চলেছে তার মধ্যে কেবল শ্রেষ্টই নয়; সুস্থ মানসিক আবেদনসম্পন্ন একমাত্র দর্শনযোগ্য নাটক 'ফেরারী ফৌজ'। মিনার্ভা থিয়েটারে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই নাটক একশত রজনীর কাছাকাছি এসেছ।

নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা এই যে, ব্যক্তিগতভাবে হোক অথবা অন্য স্তরে, অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতামত প্রকাশিত হতে পারে। কখনো কখনো আমরা এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তির একটা ভিন্ন পথ পেতে পারি, যেমন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বলছেন, 'why did it fail? 'ফেরারী ফৌজ' এবং তারপরে 'ভি আই পি'?'[২০] জবাবে শ্রী দত্ত বলছেন- ফেরারী ফৌজ did'nt fail. ফেরারী ফৌজ ran pretty well, had packed houses. তার পরে Minerva workers went on strike. 'ভি আই পি' নিয়ে আরো চিত্তাকর্ষক কথা আমরা বলতে পারব। 'ভি আই পি' -র অভিনয় ১৪-০৪-১৯৬২।[২১] কোন বিদেশি নাটক অবলম্বনে এই নাটক লিখিত, তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, প্রায় প্রত্যেক সমালোচনায় নাটকটির সংলাপের 'বদ্‌জোবান্- এর নিন্দে করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, প্রযোজনার মানের ও অভিনয়ের প্রশংসা করেও নাটকের বিষয়বস্তু, রুচিবোধ,

কৌতুকের মাত্রালঙ্ঘন- নানা অভিযোগে দুষ্ট করেছেন *দেশ* পত্রিকা (তারিখ অজ্ঞাত), *স্বাধীনতা* (২৫ মে ১৯৬২), *অমৃত* (১৮ মে ১৯৬২) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* লিখেছে-

> অনেক দিন ধরেই লিট্‌ল্ থিয়েটার নাটকে অশ্লীলতার অনুশীলন করছেন।এবার অশ্লীল ইঙ্গিতে আর কদর্য রসিকতায় তাঁরা নিজেদের পুরাতন সব কীর্তি অতিক্রম করে গেছেন।[২২]

প্রকৃত নাট্য সমালোচনা আমাদের ইতিহাসকে বুঝতেও সাহায্য করে কখনো কখনো। ১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে নিজের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় উৎপল দত্ত অভিনয় করলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই নাট্যের অভিনয় দেখে 'মঞ্চরসিক' নামের আড়ালে সমালোচক যা লিখেছেন *দর্পণ* পত্রিকার ৫ এপ্রিল ১৯৬৩ সংখ্যায়, তার প্রথম স্তম্ভটি আনুপূর্বিক উদ্ধৃত না করে পারছি না।

> নাট্যচার্য শিশিরকুমার যে যুগ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে নাটক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের উৎস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পেশাদার মঞ্চসমূহে অভিনেতৃবর্গ ও নাটকের যে স্তিমিত প্রবাহ চলেছে, তা দর্শক সাধারণের জন্য যেমন ক্লান্তিকর, তেমনই বিরক্তিকর। কেননা, আমাদের মঞ্চে প্রতিভার বিকাশ যে কোনো কারণেই হোক্ আজ অনুপস্থিত। যুগস্রষ্টা শিশিরকুমারের জীবিতকালে আমরা পেশাদারী মঞ্চের বাইরে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন হতে দেখেছি। এই অধ্যায়টি সমান্তরাল হয়েও পেশাদারী মঞ্চের পরিপূরক ছিল সন্দেহ নেই। আমরা বলছি 'নবান্ন' নাটক এবং তার প্রযোজনার কথা। "দুঃখীর ইমান" নাটক প্রযোজনা করে এই ঐতিহাসিক অধ্যায়ের মর্যাদা দিয়েছিলেন শিশিরকুমার। আজও পেশাদারী মঞ্চে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি এই অধ্যায়ের পরবর্তী রূপ..... 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহ্যকে পেশাদারী মঞ্চের পাদপ্রদীপে নবতর ভঙ্গিতে হাজির করার মধ্যে সেই বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে। এল টি জি-র পূর্ব নাট্য প্রযোজনা 'অঙ্গার' এবং 'ফেরারী ফৌজ' এই নাট্যপ্রযোজনার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়েছে।... আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে সৃজনশীল ক্ষমতার এমন পরিপক্কতার কারণে। কারণটি ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। দর্শকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং ক্রমাগত বাজে ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার প্রগলভ

আচরণ থেকে নিজেদের সংযত করে পেশাদারী যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উক্ত গ্রুপ নিঃসন্দেহে আদর্শ স্থাপন করলেন।[২৩]

সমালোচক এরপর নাট্যবিন্যস্ত কাহিনির পরতে পরতে উপস্থাপনাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তার আগে বলেছেন-

নাট্য প্রযোজনায় নট, নাট্যকার ও পরিচালক শ্রী উৎপল দত্ত সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন অনেকের কাছে। সাহিত্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রী সুবোধ চৌধুরী এবং মালো জীবনের অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছেন শ্রী চিন্তাহরণ বর্মণ। উৎপলবাবুর ইউরোপ ভ্রমণ এবং বৈদেশিক নাট্য অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে। বিশেষ করে জার্মান দেশের বিখ্যাত প্রতিভাধর নাট্য বিশেষজ্ঞ ব্রেখট্-এর শিল্পতত্ত্ব থেকে তিনি ঐশ্বর্য পেয়েছেন অনেক। নাট্য রচনায় যে স্টাইল তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ কন্‌ভেন্‌শনের বিরোধী। যদিও ইউরোপে এই রীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে, তবু এদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে। আশা করি, এই রীতি রসিক দর্শকদের কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। গণজীবনের রূপরেখা রচনায় গভীর দ্যোতনাব্যঞ্জক জঙ্গম শিল্প প্রচেষ্টা দিক্ নির্দেশ করবে ভবিষ্যতের নাট্যপ্রবাহকে। (পূর্বোক্ত)

এই ধরনের সমালোচনা কেবল থিয়েটারকে নয়, আমাদের নাট্য-ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, সমাজচিত্রের পরিস্ফুটন, অসংখ্য চরিত্রের উপযুক্ত মঞ্চ অবস্থিতি, লোকগানের প্রয়োগ সবকিছুই অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* লিখেছে-

নাটকের মঞ্চব্যাপ্তির উদ্ভাসন অভিনব। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়েই এই রঙ্গমঞ্চ। শিল্পীদের কখন কোথা দিয়ে আবির্ভাব ঘটবে অনুমান করা শক্ত। এই নাট্য-সংযোজন কিছুটা যাত্রাবাহী হলেও এটি গতানুগতিক ধারার এক অভিনব ব্যতিক্রম বলতেই হবে। (০৫-০৪-১৯৬৩)।

মিনার্ভার মঞ্চে যেন একটি নদী বয়ে চলেছে। তারই পারে ধীবরদের বাস। তাদের গোষ্ঠীজীবনই রূপ নিয়েছে মিনার্ভার স্থাণু মঞ্চে- লিখছে *অমৃত* (০৬/০৪/৬৩) পত্রিকা।

দেশ লিখছে- তিতাসের তীরের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র অঙ্কণে কোনো খুঁত রাখেননি নাট্যকার-পরিচালক। ওই সম্প্রদায়ের উৎসব, পার্বণ-ব্রতপালন, আনন্দময় পরিবেশ, জীবন সংগ্রাম, সংস্কার ও বিশ্বাস নাটকটিতে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত। এবং সেইসঙ্গে ওই সম্প্রদায়ের মানুষদের বেশভূষা এবং ওদের ভাষা ও কথা বলার সুরটিও আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে নাটকটিতে বিধৃত। (২৩ চৈত্র, ১৩৬৯)।

কোনো কোনো পত্রিকায় মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘোচানোর প্রশ্নে শিশিরকুমারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, রামকেশর রূপী বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়ের প্রশংসায় তাঁকে 'নবনাট্যের নায়ক' বলা হয়েছে। যথাক্রমে *অমৃত, যুগান্তর, পরিচয়, দেশহিতৈষী, স্বাধীনতা, উল্টোরথ* প্রভৃতি বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং *The Statesman* (New dimension to old stage), *Cine Advance* (Spiritual Renaissance of theatre at Minerva), *Indian Express, Times of India* এই নাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কেবল *গন্ধর্ব* পত্রিকার ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (১৯৬৩)-য় এক দীর্ঘ বিধ্বংসী লেখায় প্রযোজনাটিকে শুইয়ে দিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষে লেখেন-

> তিতাসের কাহিনি নিয়ে মার্কটাইম শেষ হলে শ্রী উৎপল দত্তের পরিচালনায় বাংলা নাটকের অগ্রগতি দেখবার জন্য সবাই উন্মুখ। এবং তিনি তাদের হতাশ না করার মতো ক্ষমতার অধিকারী।[২৪]

আমাদের বিবেচনায় এই লেখা দুজনের সম্পর্ককে নিশ্চিত ভারাক্রান্ত করেছিল, আর তাই জীবনের একেবারে শেষে এক সাক্ষাৎকারে শ্রী দত্ত হ্যারল্ড পিন্টার এবং তাঁর নাটক 'তেত্রিশতম জন্মদিবস'- যার অনুবাদ করেছিলেন পবিত্র সরকার, এবং যা নতুন গড়ে তোলা 'নান্দীমুখ' সংস্থা থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় প্রযোজিত, সেই নাটক সম্পর্কে বিধ্বংসী ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা করতেন না।[২৫]

'তিতাস...'-এর পর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'প্রফেসর ম্যামলক'। অভিনীত হয় ৫ নভেম্বর ১৯৬৪তে, মিনার্ভা থিয়েটারে। ফ্রিডরিশ ভোলভ্ রচিত জার্মান নাটক, অনুবাদ উৎপল দত্তের। এই নাটক অবলম্বনে একটি রুশ ও একটি জার্মান ছবি হয়েছিল, যেগুলি কলকাতার দর্শকরা দেখেছিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধী কমুউনিস্ট ভাবাদর্শের এই নাটক হিটলারের পতনের পূর্ব অবধি জার্মানিতে অভিনীত হতে পারেনি। বিজ্ঞানী প্রফেসর মামলকের ফ্যাসিস্টদের দ্বারা পরাস্ত হবার এই নাটকের সামগ্রিক মঞ্চায়নকে আন্তর্জাতিক মানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে *সাপ্তাহিক বসুমতী* পত্রিকায় (১২/১১/১৯৬৪) একই কথা লিখেছে *দর্পণ* (২০/১১/১৯৬৪)।

যদিও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর তুলনায় অনেক বেশি প্রচারের আলোয় এসেছে 'কল্লোল' (২৮/০৩/১৯৬৫, মিনার্ভা) তার বিষয় এবং আঙ্গিকের দৌলতে। নাট্যশোধ সংস্থান থেকে সংগৃহীত এক লেখায় পাচ্ছি সুখ্যাত মার্কসবাদী লেখক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্ভবত *স্বাধীনতা* পত্রিকায়, ০৪/০৬/১৯৬৫) লিখছেন যে, 'এল টি জি' 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' এবং 'ওথেলো'য় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এইবার-

উৎপল দত্তের এই দুর্দান্ত শিল্পপ্রতিভা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বিদ্রোহী খাইবার জাহাজের মধ্যে যে বলিষ্ঠ কল্পনা, ঘটনার নাটকীয় সংস্থান, সমুদ্র, জাহাজ ও যুদ্ধের বিচিত্র মঞ্চসজ্জা, কাহিনীর গতিবেগ, বলিষ্ঠ চরিত্র রূপায়ণ এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আঘাতের মাধ্যমে যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একমাত্র সেই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়...বিশেষতঃ এই নাটক কেবল ভারতীয় জাতীয়তাবোধেরই নতুন পরিচয় নয়, ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্থির, বিক্ষুব্ধ এবং বিপ্লবোন্মুখ যুবমানসের পরিচায়ক।

অন্য এক পত্রিকায় শৈলেশ চৌধুরির লেখার হেডিং হচ্ছে- লিটল থিয়েটার গ্রুপ কলকাতার নাট্যজগতে ঝড় তুলেছে। এই নাটকে ইতিহাস-বিকৃতির অভিযোগে উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবং তার বিরুদ্ধে কলকাতার রাজপথে সত্যজিৎ রায় সহ অনেককে নিয়ে মিছিল বেরোনোর ঘটনা আমাদের জানা আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী দত্ত বলছেন- কেননা "কল্লোল"কে উঠিয়ে দেবার জন্য ওরা

একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। কিছুতেই যখন ওঠানো যাচ্ছিল না, কোনো আইন হাতে নেই, তখন ওরা স্থির করেছিল যে এটাকে বাহুবলে বন্ধ করা হোক...আমাকে গ্রেপ্তার করে... [২৬]

এই সংকটের জন্য দায়ি ছিল কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা। মুখ্যত *আনন্দবাজার পত্রিকা* আজো পর্যন্ত যাদের পরিচয়, তারা সরকার-পন্থী। কিন্তু তার আগে আমরা বলব *পথিকৃৎ* পত্রিকার কথা, যেখানে অস্বাক্ষরিত দীর্ঘ লেখায় 'কল্লোল' প্রসঙ্গে ইতিহাস বিচ্যুতির অভিযোগ তোলা হল। পাতার পর পাতা ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে 'কল্লোল'-এর অমিল দেখিয়ে তারা লিখলেন-

> ১৯৪৬ সালের বোম্বাইয়ের সাধারণ মানুষের দৃঢ় সংগ্রাম শুধুমাত্র সংগ্রামী নেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল- ভারতজোড়া বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ পেল না। এ ঘটনা দুঃখের, লজ্জার। সেই লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করলেন উৎপলবাবু। সাধারণ দর্শককে একথা বুঝিয়ে যে, সঠিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সেদিন ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতাই সংগ্রামের অসাফল্যের কারণ। উৎপলবাবু এখানে চমৎকার কল্পনার আশ্রয় নিলেন-যেমন নেতৃত্ব হলে ভালো হত তেমনটা দেখিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনকার ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতিহাসের সঠিক পর্যালোচনা এটা নয়। সেদিনের যে ভুল, সে ত্রুটি আজ সঠিকভাবে উপস্থাপিত না করে, মিথ্যে চাপা দেবার চেষ্টা করলে ইতিহাসের বিকৃতিই করা হয় এবং ভুল শোধরাবার পথও বন্ধই করে দেয়া হয়।[২৭]

এমন কি এই প্রযোজনার অভিনেতাদের নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এই বলে- লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনেতাদের একটা মহৎ গুণ তাঁরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নড়াচড়া করতে শিখেছেন। ঠিক কলের পুতুলের মতোই তারা চলাফেরা করেন-জীবন্ত মানুষ বলে মনে হয় না তাঁদের। (পূর্বোক্ত) সমগ্র লেখাটি পড়লে অবশ্য মনে হতেই পারে, 'কল্লোল'-কে ধ্বসিয়ে দেওয়াই এই লেখার উদ্দেশ্য। শোভা সেনের সঙ্গে সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল ঘোষের অভিনয়ের সঙ্গে এই নাট্যে প্রতিবেদক কেবল আলো ও মঞ্চসজ্জার কাজকে ভালো বলেছেন, এমন কি আবহে 'ইন্টারন্যাশনাল' ব্যবহার করাও আপত্তিকর বলা হয়েছে।

আনন্দবাজারের (১১/০৬/১৯৬৫) বক্তব্য এবার উদ্ধার করা যাক। তুলনামূলকভাবে এদের সুর কিছুটা নরম বলেই মনে হয়। নাটকের সূত্রধার খাইবার জাহাজকে প্রতীক ধর্মী বলে তা আসলে 'ইতিহাসের বিকৃতি – সাধনের সুবিধার জন্য বলেই তাদের অনুমান' কংগ্রেস সেবী একটি চরিত্রকে নিয়ে উপহাস করাটা সরলীকরণ মনে হয়েছে, ঘটনার সমাবেশে চরিত্রদের সংলাপে ও আচরণে লজিকের অত্যন্ত অভাব লক্ষ করেছেন তারা। বিশেষত মাঝে সুভাষ চন্দ্রের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের গুণগাণ করাটাকেও ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তির সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাদের মত ফ্যাসিস্ট সুভাষ বসু তখন ওদের ঘৃণার পাত্র। টকিট ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখেই কি তবে এইসব স্তুতি বাক্যের আয়োজন? পরিশেষে নাট্য- সমালোচক নামে চিহ্নিত এই লেখায় লেখকের বক্তব্য –

> নাটকে গোলাগুলির ব্যাপার প্রচুর। ফলে প্রায়শ কানফাটা আওয়াজের সৃষ্টি। তবে লিটিল থিয়েটার দলের নাটকে কড়া আওয়াজ আর কিছু নোংরা কুরুচিকর সংলাপ যে অপরিহার্য পর্যায়ে পরে সে কথা এতদিনে নাট্যামোদীরা জেনে গিয়েছেন।[২৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'কল্লোল' নিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এবং কম্যুনিস্টদের নিয়ে যতই মাতামাতি করা হোক ১৯৬৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমি দেশের নানা ভাষার পনেরোটি নাটক নিয়ে যে 'নেহেরু শতাব্দী নাট্য সমারোহ' আয়োজন করেছিলেন সেটির উদ্বোধন হয় 'কল্লোল' নাটক দিয়ে। *দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া* পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে লেখা হয় যে ওই বছরে ২৯শে মার্চ ৮৫০টি অভিনয় পার হয়েছে, রাষ্ট্র যে নাটকের বিরোধিতা করে বন্ধ করেছে, সংবাদপত্র যার বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করেছে, উৎপল দত্ত বিনা বিচারে আটক হয়েছেন, সে নাটক কেন হিন্দিতে অনুদিত বা অভিনীত হল না?

৪

এরপরেই 'এল টি জি' গ্রুপের সেই বিতর্কিত প্রযোজনা 'তীর', যার ফলশ্রুতিতে দলটির আমূল বদল হয়। 'অঙ্গার' প্রযোজনার সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনেতা রবি ঘোষ (সনাতন) যখন দল ছেড়ে দেন, তখন তাকে তাঁর সিনেমার ব্যস্ততা বলে চিহ্নিত করে বিষয়টিকে সরল করেই দেখেছিলেন উৎপল দত্ত, 'দীর্ঘতম সাক্ষাৎকারে' সেইভাবেই বলেছিলেন। কিন্তু শেখর চট্টোপাধ্যায়, 'কল্লোল'-এর শার্দুল সিং, শত সমালোচনাতেও যাঁর অভিনয় প্রশংসিতই হয়েছিল, তিনিও এই সময়ে 'এল টি জি' ছাড়েন। উত্তরকালে তাঁকে আমরা 'থিয়েটার ইউনিট' গঠন করতে দেখব।

'তীর' বিষয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় উৎপল দত্ত বলছেন যে ১৯৬৭ সালে যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়, তখন-

> নকশালবাড়ি আন্দোলনকে চীনের পার্টি সাপোর্ট করে বসল। সেইটাতেই আমাদের বিভ্রান্তি। অর্থাৎ immaturity আমাদের। চীনের পার্টি বলে দিল যে ওইটাই লাইন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবলাম- হ্যাঁ, ওইটেই লাইন। যে আমি কি না, সোভিয়েত বলছে বলে ট্রটস্কিকে czar-এর spy বলে মানিনি, ওই period-এ, যখন স্তালিন বলতে সব একেবারে, স্তালিনের নাম বলতে দাঁড়িয়ে উঠত সবাই, সেই আমি কিনা চীন বলেছে বলে নকশালবাড়ির আন্দোলনের সমর্থক হলাম। ভুল...মস্ত বড়ো। তার ইফেক্ট্ এসে পড়বেই।[২৯]

যদিও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'তীর' was a very good production, তবু আমরা 'তীর' নাটকের তিনটি সমালোচনা একটু উল্টেপাল্টে দেখব। প্রথমটির লেখক পবিত্র সরকার। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর লেখা, 'মুক্ত অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'তীর'- এর মতো একটি অস্ত্রের উপযোগিতা নিয়ে অসামান্য মস্করা করে শেষে বলছেন, এ নাটকের শেষে মিলিটারি এবং পুলিশদের অরণ্যবাসীদের তীরে পরাস্ত হওয়া নিছক সস্তা poetic justice টেনে এনে মনের ক্রোধকে তৃপ্ত করা, দর্শককে কেবল হাততালির তৃপ্তি উপহার দেওয়া।[৩০] মুখ্য দুএকটি চরিত্রে শ্রী সরকার তীব্র অসঙ্গতি লক্ষ

করেছেন, কটু মন্তব্যও করেছেন, যেমন উৎপলবাবুর হাতে Satire-এর চেয়ে Humour খোলে বেশি- বিদ্রুপ তাঁর হাতে একটু বিকৃত রূপ পায়। কিন্তু তিনিও সার্বিক প্রযোজনাটির ভুয়সী প্রশংসা করে শেষে বলেন- তীর নাটক হিসেবে দুর্বল, কিন্তু দুর্বল বস্তুকে কেবল প্রযোজনার তেজ ও নিপুণতার সাহায্যে কী অবিশ্বাস্য দৃশ্যরূপ দেওয়া যায়- তা দেখার জন্য নাট্যরসিক মাত্রেরই এ নাটক দেখা উচিত। (পূর্বোক্ত,পৃ ৬৭)

পার্থ রাহা *দ্বন্দ্ব* পত্রিকায় 'তীর' নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। তাঁর কাছে নাটকটি মনে হয়েছে 'ডকুমেন্টারি' সুলভ। বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি (তাঁর মতে) নকশালবাড়ির এই কৃষক বিপ্লবকে ছুরী মারতে চেয়েছে। এ কথা তিনি প্রচুর ব্যঙ্গোক্তি গালি গালাজের মধ্যে চীৎকার করেছেন... উৎপলবাবু আবার কিন্তু আমাদের আশ্চর্য করে দিয়েছেন।... বিশেষত হাল আমলের শৌখিন 'লাল' মার্কা নাটক থেকে আরম্ভ করে 'কিমিতিবাদী' পর্যন্ত আমরা যে পরিশ্রমনীতি সস্তায় বাজীমাৎ করার চেষ্টা দেখি অথবা আমরাও করে থাকি উৎপলবাবু তাঁদের লজ্জা দেবেন। প্রতিটি উপজাতির বৈশিষ্ট্য আচার ব্যবহার-সংগ্রামী গান সবই আমাদের অন্য এক জগতে নিয়ে যায়।[৩১] কিন্তু এই সমালোচনায় সামগ্রিক অভিনয় প্রশংসিত হয় নি, বরং কেবল দৃশ্যকল্পনা দিয়ে শেষ অবধি নাটক সার্থক হয় না, এই স্পষ্ট অভিমত সমালোচকের।

গোপাল মজুমদার সম্পাদিত *দেশব্রতী* (১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮) 'তীর'- কে বাংলা মঞ্চের 'সর্বপ্রথম কৃষিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের নাটক' বলে চিহ্নিত করেছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে- ...অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছাড়াও এ নাটকে রয়েছে বিপ্লবী আশাবাদ, যা নীলদর্পণে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পত্রিকাটি স্পষ্টতই নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। নকশালবাড়ির ইতিবৃত্ত তিন ঘন্টার অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নিরপরাধ দশজন কৃষক রমণীর অতর্কিত হত্যার দৃশ্যে গোটা প্রেক্ষাগৃহ যেন ক্রোধের উষ্ণ নিশ্বাসে রুদ্ধবাক হয়ে গিয়েছিল। অতিরঞ্জন নাই, ভাবালুতা নাই- যা যেখানে ঘটেছে এবং আজও ঘটছে তারই বাস্তব ছবি... 'তীরে'র কাহিনী নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত নয়, তিনি নকশালবাড়ি গিয়েছিলেন, প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং সেই জন্যই 'তীর' দলিল হিসাবে তথ্যনিষ্ঠ।

প্রসঙ্গত, সমালোচক পার্লামেন্টের সদস্যরা কখনো সরোজমিনে যান নি। বলা বাহুল্য, আমরা মিনার্ভায় 'এল টি জি'-র সব কটি নাটক নিয়ে আলোচনা করিনি, পরেও করব না। 'তীর'-এর পরের প্রযোজনাই 'মানুষের অধিকারে' (১৪/০৭/১৯৬৮)। তারপরেও 'যুদ্ধং দেহি', 'লেনিনের ডাক' অভিনীত হয়েছে মিনার্ভায়, পরের বছর। কিন্তু ১৯৬৮-কেই বলা যেতে পারে, মিনার্ভা এবং 'এল টি জি' নিয়ে উৎপল দত্তের শেষ পর্ব। এরপর ঘটবে পালাবদল। ১৯৬৮-র মধ্যে অনেক কটি নতুন দল কাজ শুরু করে দিয়েছেন, আমরা এরপর তাদের কথায় আসব। জীবনীকারের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী উৎপল দত্তের সিনেমায় অভিনয়ের শুরু ১৯৫০ থেকে, কিন্তু সমাপতন কিনা বলতে পারব না, ১৯৬৮-তেই পিনাকি মুখার্জী পরিচালিত 'চৌরঙ্গী' ছবিতে মার্কো পোলোর ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের পর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। তাঁর নাটকে সংলাপ রচনার মধ্যেই যে বিশিষ্ট অভিনয়রীতি নিহিত ছিল সেই 'অঙ্গার' থেকেই, দ্রুত এবং কাটা কাটা, রিয়ালিস্টিক কিন্তু স্টাইলাইজিড্, এ এরপর থেকে তাঁর চলচ্চিত্রাভিনয়েরও বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে।

যে পবিত্র সরকার 'তীর' নাটকের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন-

> আগে পটভূমিকার কথা ভেবেছেন এবং সাততাড়াতাড়ি দু-একটা ঘটনা তৈরি করে তা সেই পটভূমিকার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।... আসলে প্রেমের গল্পটা-মূল নাটকের সঙ্গে আলগাভাবে লেগে থাকত... মিনার্ভায় উৎপল দত্তের নাটক হলেই... বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্লান্তিকর ঐক্য রক্ষা করত ওই ত্রিকোণ প্রেম।[৩২]

তিনিও 'মানুষের অধিকারে'-কে নাটক হিসেবে সবচেয়ে পরিণত বলেছেন। আমরা অবশ্য মনে করি। বিচারালয়ের দৃশ্য রচনায় উৎপল দত্তের মুন্সিয়ানা 'অঙ্গার' নাটকেই আমরা পেয়েছিলাম, এই নাটকে সেই আদালত দৃশ্য রচনার বিশেষত্ব বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে শ্রী সরকারের কলমে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই নাটকের বিচার করেছেন তিনি, বিশেষ করে শ্রী দত্তর অভিনয়ের।

আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় তাঁর মতামত। এখানে উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও আমরা নেব।

> লোকের মনে তো এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হতে বসেছিল যে, উৎপলবাবু মোটেই ভালো অভিনেতা নন, চ্যাঁচামেচি ও ভাবভঙ্গি করে উৎরে যান। যতদূর মনে পড়ে উৎপলবাবুর একজন দলত্যাগী একসময় ইংরেজি কাগজে চিঠি লিখেছিলেন এই মর্মে যে, উৎপলবাবু প্রযোজক হিসেবে প্রথম শ্রেণির, পরিচালক হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণির, এবং অভিনেতা হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির। কথাগুলি যে নেহাত বিদ্বেষবশত বলা তা এত ভালো করে, দু-একটি ফিল্‌মে সংক্ষিপ্ত অভিনয় ছাড়, উৎপলবাবু আর কোথাও ধরিয়ে দেন নি।... বিচিত্রভাবে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন, এবং প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই রীতিমতো শক্তিশালী। বোঝা যায়, অত্যন্ত সহজে তিনি তাঁর ভূমিকাকে দখল করে রেখেছেন, ফলে তাঁর তুচ্ছতম কথাও দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় না।

এমনি আরো সব কথা, প্রযোজনার খুঁটিনাটি নিয়ে। শেষে অভিযোগ, নাটকটি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল কেন। দর্শকরা সবাই কি খুব সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি থেলে এই নাটকটির উপর অনাস্থা প্রকাশ করলেন? এই প্রশ্নের একটা বিপরীত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে *দর্পণ* পত্রিকার নাট্য সমালোচকের মতে। নাটকের শেষ দুটি দৃশ্য প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

> খুব দরকার ছিল বলে মনে হয় না, অন্তত নাটকের দিক থেকে। অবশ্য এখানে আরেকটি কথা মনে আসা স্বাভাবিক। মাত্র কিছুদিন আগে শ্রী দত্তের মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাও এখনও সকলের মনে আছে এবং সন্দেহ হয় শ্রীদত্ত বোধ হয় ওই দুটি দৃশ্য যোগ করেছেন (নাটকটি যখন গত বছর শারদীয়া গন্ধর্বতে বেরোয় তখন এই দুটি ছিল না) বিপ্লবের প্রতি তাঁর অটুট আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য।[৩৩]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত এই প্রসঙ্গে কী বলেছেন একবার দেখা যাক। তিনি বলছেন, সি পি এমও 'কল্লোল' সম্পর্কে ভীত ছিল। আবার কী পদ্ধতিতে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন, সেসব জেনেও নকশালরা ভেবেছে তিনি treachery করেছেন। ...এইসব

যখন প্রচণ্ড টালমাটাল অবস্থা চলছে, ওদিক থেকে নকশালদের attack আসছে, এদিক থেকে C P I M-ও criticize করছে, এই সময়ে আমরা 'মানুষের অধিকারে' করলাম।[৩৪]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র বলছেন-

মানুষের অধিকারে-এর আগে সেই অর্থে উৎপল দত্ত কোনো বড়ো ভূমিকায় অভিনয় করেন নি।[৩৫] এই প্রসঙ্গে তিনি যাঁরা নিজেরা পরিচালনা করেন তাঁদের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবার সমস্যা প্রসঙ্গে কিছু নমুনা দেন শম্ভু মিত্র এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবাদে, কিন্তু কেবল এইটুকু নয়, উৎপল দত্তকে তিনি কোনো অর্থেই খাটো করছেন না, এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (ভক্তপ্রসাদ) এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' (কালোবরণ) অভিনয়কেও[৩৬] গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু 'মানুষের অধিকারে'-এর বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত-

> লিবোভিৎস একজন এতবড়ো মাপের উকিল, ঐতিহাসিক চরিত্র, সত্যিই ছিলেন তিনি। সেই নাম, সেই ইতিহাস, সেই তর্ক, এই সবটাকে নিয়ে আসেন মঞ্চে।...এবং সেইটে করতে গিয়ে উৎপলবাবু ওই দায়বোধ করেন যে তাহলে ওই ভূমিকাটি তাঁকেই করতে হবে।...শুধু থিয়েটার জমিয়ে দেবার জন্য নয় বা নিজেকে অভিনেতা হিসেবে জাহির করবার জন্য নয়। তারপরেও বহু নাটকে উৎপলবাবু কিন্তু ছোটো ভূমিকা, তুচ্ছ ভূমিকায় থেকেছেন।[৩৭]

'মানুষের অধিকারে'-র পরে 'এল টি জি'-তে ভাঙন আসে। 'এল টি জি'-র নামে এরপর মিনার্ভায় অভিনীত হয় দুটি নাটক 'যুদ্ধং দেহি' (২৪/১১.১৯৬৮) এবং 'লেনিনের ডাক' (১৬/১১/১৯৬৯)।[৩৮] এর পাশাপাশি, নানা জায়গায় এক আধটি নাটক করেন উৎপল দত্ত, ১৯৬৯তেই "বিবেক নাট্য সমাজ" নামে কাজ শুরু করে দিচ্ছেন মিনার্ভার বাইরে, তারপর 'লোকনাট্য' নামে তাঁর সঙ্গীসাথীরা দল তৈরি করে যাত্রা ও নাটকের মিশেল ঘটিয়ে দু একটি কাজ করছেন, সিনেমায় তাঁর আসন ক্রমশ পাকা হচ্ছে, এবং অবশেষে ১৯৭১-এ 'পি এল টি' গড়ে উঠছে। 'বর্গী এল দেশে' (২/১/১৯৭১), 'সূর্যশিকার' (২৮/৩/১৯৭১), 'ঠিকানা'-র পর বিখ্যাত 'টিনের তলোয়ার'। আমাদের

পরের অধ্যায়ে আলোচিতব্য। আপাতত 'নান্দীকার'-এর আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে, আমরা 'নান্দীকার'- এর অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর 'মানুষের অধিকারে' সমালোচনায় নজর দিতে চাই। পবিত্র সরকার একসময়ে 'নান্দীকার-এ' থিয়েটার করেছেন, কাজেই তাঁর লেখায় থিয়েটারের শক্তি এবং তার দুর্বলতা ধরা পড়ে অনেকটাই, কিন্তু কেয়া লিখেছেন আগাগোড়া থিয়েটারের চোখ থেকে। তিনি বলতে চেয়েছেন, তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমীরা রাজনৈতিক নাটককে এড়িয়ে চলেন, কিন্তু তাঁর মত এই – নাটক থেকে রাজনীতিকে নির্বাসন দেওয়ার অর্থ আধুনিক মানুষের মনের একটা বড় অংশকে অকারণে খারিজ করে দেওয়া। বরং দেখতে হবে, নাটকটা নাটক হল কিনা। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত- কোর্টরুম নাটক হিসাবে প্রযোজনার সাফল্য অসাধারণ... অতিরঞ্জন নেই বললেই চলে, ভাঁড়ামি নেই, বৃথা উত্তেজনাকর বক্তৃতা বিশেষ নেই। খারাপ গালাগালি মোটে তিন চারিটি আছে। ওটুকু না থাকলে প্রায় ভুলেই যেতাম লিট্‌ল্ থিয়েটারের নাটক দেখতে এসেছি।... ঐতিহ্যময় নিখুঁত মঞ্চসজ্জা-রেল স্টেশন কেটে এনে বসিয়ে দিয়েছে মনে হবে। অভিনয়ে সকলের প্রশংসা করেন নি, শেষ দৃশ্যে প্রায় প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে খুব নিস্প্রাণ লাগছিল।[৩৯]

নান্দীকার

'নান্দীকার' বলতে দমদম শাখা 'আই পি টি এ', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) লিখিত মৌলিক নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সেতুবন্ধন' নাটকের (এটি অবশ্য অভিনীত হয় 'নান্দীকার' প্রতিষ্ঠার পর, রঙমহল, ১২/০২/১৯৬১) অভিনয়, পরবর্তীতে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, মায়া ঘোষ, চিন্ময় রায়, সত্যেন মিত্র, মহেশ সিংহ, অজয় গাঙ্গুলি, পরবর্তীকালে কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী। আন্তন চেকভ্-এর ছোটো নাটক ইত্যাদি থেকে ইবসেনের 'বিদেহী' ('ঘোষ্টস্'-রঙমহল, ১১/০৯/১৯৬০)[৪০] এবং তার থেকে আরো কিছু নাটক হয়ে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অনুদিত লিউইজি পিরানদেল্লোর নাটক 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (সিক্স ক্যারাকটার ইন সার্চ অব অ্যান

অথর) থেকে ‘নান্দীকার’ এবং অজিতেশের পরিচিতি স্থায়ী হয়। এবং ক্রমে এই সংস্থা বিদেশি নাটকের রূপান্তর অভিনয়ের দিশারি হয়ে উঠবে।

সকলেই জানেন, ‘নাটকের মধ্যে নাটক’ ইতালিয়ান নাট্যকার লুইউজি পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬)-র প্রিয় নাট্যকৌশল। ‘নান্দীকার’-এর প্রযোজনার আগে এই প্রকৌশল বিষয়ে কলকাতার নাট্যমহল বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তাত্ত্বিকেরা তাঁকে ইতালির ‘ইন্টেলেক্চুয়াল ড্রামা’-র উদ্গাতা বলতে চেয়েছেন। ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’ একটু বেশিই চিন্তা ঋদ্ধভাবে ব্যক্তির, বাস্তবের ব্যাখ্যা করে, সামাজিক সংস্কারগুলিকেও আক্রমণ করে, ফলে নাটকটির শিল্পগুণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষত কমবয়সী ছেলেমেয়েদের পক্ষে বেশ প্রাপ্তবয়স্ক আবেদন রাখে এই নাটক, ফলে ‘নান্দীকার’ দর্শক পেয়েছিল প্রচুর, বেশির ভাগই কমবয়সী, বয়স্করা একটু ছি ছি-ই করেছিলেন। তবে, সমালোচক ধ্রুব গুপ্ত পিরানদেল্লো নিয়ে বিশদ আলোচনার পরে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন-

> আর এমনি একজন নাট্যকারের এমন একটি নাটককে বাংলাতে রূপান্তরিত করে কেউ যদি অভিনয় করেন তবে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে।... বুর্জোয়া নীতিবোধের অসারতা, সামাজিক ব্যাভিচার, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কের জটিলতা আমাদের আধুনিক জীবনকে পীড়ন করে-সেজন্য ঐসব সমস্যাকে আমাদের সমস্যা মনে করাতে কোনো বাধা নেই... দ্বিতীয় প্রশ্নটি একটু জটিল। প্রথমেই মনে হতে পারে ন্যাচারালিজমের সুস্থ আদর্শ গড়ে ওঠবার আগেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফ্যাশনে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হল তত্ত্বের একটা বিশাল অংশ conventional মঞ্চব্যবসার প্রতি ব্যঙ্গাশ্রয়ী-সেগুলি আমাদের দেশেও নিতান্তই সুপ্রযুক্ত এবং উপভোগ্য...অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপভোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে মিলে তাতে পেশাদারী ব্যবসাবৃত্তির প্রতি ব্যঙ্গটা ফুটেছে ভালো।[৪১]

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হল হয়তো, কিন্তু ‘নান্দীকার’ এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক নির্বাচনের প্রবণতা এইখান থেকেই চিহ্নিত করা যায়। ‘ন্যাচারালিজম্-‘এর প্রতি ‘নান্দীকার’-এর একটি

আকর্ষণ যেন এই সময়েই লক্ষ্য করা গেল। বহু প্রশংসিত এবং আলোচিত আন্তন চেকভের 'দ্য চেরি অর্চার্ড'-এর বাংলা রূপান্তর এইবার মঞ্চস্থ হল 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'- ১০ নভেম্বর ১৯৬৪ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। আমাদের কথার প্রতিধ্বনিই যেন শোনা যায় *দর্শক* পত্রিকার ৫ জানুয়ারি ১৯৬৫ সংখ্যার প্রতিবেদনে[৪২]। যদিও তারা এই প্রযোজনার মধ্যে অজস্র ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন, যথা তাপস (মূলের ট্রপিনভ) এবং লাবণ্যপ্রভা (আন্দ্রিয়েভনা) যান্ত্রিক চরিত্রায়ন, এদের সংলাপের বিবৃতিধর্ম মূলে এদের যে গভীরতা এবং ব্যাপ্তি ছিল, তা নষ্ট করেছে। তাছাড়া প্রযোজনাটি বঙ্গীকরণের অসাফল্যে সামগ্রিকভাবে একরকম হতাশাজনক।

গন্ধর্ব পত্রিকার সমালোচকেরও মনে হয়েছিল এই নাটকে 'নাট্যকারের সন্ধানে...'র মতো দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের মান কিছুটা ক্ষুণ্ণ। তার অন্যতম কারণ হল দুটি চরিত্রের অভিনয়ে ব্যর্থতা (লাবণ্যপ্রভা এবং গিরীন্দ্রনারায়ণ এবং আর একটি চরিত্র রূপায়ণে অস্পষ্টতা (তাপস)।[৪৩] সকলেই এই নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। ইতিপূর্বেকার নাটকের জন্যেও তাঁর সুনাম বৃদ্ধি হয়েছিল। শম্ভু মিত্র অজিতেশকে ইউজিন ও নীলের নাটকের বই উপহার দিয়ে লিখে দিলেন- আগামী যুগের অনন্য অভিনেতাকে।[৪৪] রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-

> অজিত overnight became a star of Bengali theatre. সুব্রত ব্যানার্জী করুণা ব্যানার্জী অমুক তমুক আরো অনেক লোকেরা যারা বলতে আরম্ভ করলো যে আর একটা পর্যায় এল বাংলা থিয়েটারে, একেবারে বলতে আরম্ভ করল যে, বহুরূপী ছিল, L T G ছিল এইবার আর একটা ধরনের থিয়েটার, আর একটা স্বাদের থিয়েটার, আর একটা power এর থিয়েটার এসে গেছে।[৪৫]

নিঃসন্দেহে সেই স্বাদ ছিল স্বভাববাদ-বাস্তববাদের। সেই জায়গা থেকে 'মঞ্জরী...' প্রযোজনাটিও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথমত এর রূপান্তরের পর 'নান্দীকার'-এর তরফে পবিত্র সরকার একটি অস্বাক্ষরিত লেখা লেখেন যেখানে স্পষ্টতই দাবি জানানো হয়-

> বাংলা নাটক কথাটির অর্থ আমাদের কাছে ভাষাগত নয়, ভাবগত। যে বাংলা নাটক মুদ্রিত বা অভিনীত কোনো রূপেই বাঙালির প্রাণে আবেগস্পন্দিত হওয়ার জোর রাখে না তা বাংলা লিপির ওকালতি সত্ত্বেও বাংলা নাটক নয়। কিন্তু যে নাটক মহাসমুদ্রের ওপার থেকে এসেও আমাদের বুকে আলোড়ন তোলার সম্ভাবনা রাখে তা বাংলা নাটক।[৪৬]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 'বহুরূপী', 'এল টি জি'-তিনটি নাট্যদলই কাছাকাছি সময়ে ইউরোপীয় স্বাভাবিকবাদকে গ্রহণ করেছিল। 'এল টি জি' তাঁদের প্রযোজনায় ইবসেনের দুটি নাটক 'গোস্টস' এবং 'ডলস হাউস'-কে শুধু বাংলায় অভিনয় করেছিলেন- পরিবেশ চরিত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ এক রেখে, তবে অপরিচিত মঞ্চপরিবেশ দর্শকদের যেন খানিকটা দূরে ঠেলে দেয়, নাটকের প্রাণকেন্দ্রে তারা যেন পৌঁছতে পারেন না।[৪৭] ফলে, 'বহুরূপী' যেমন 'রাজা অয়দিপাউস' ছাড়া আর সব নাটককেই দেশি করে নেন, 'নান্দীকার'ও তেমনি 'আন্তিগোনে' ব্যতিরেকে বাকি সব নাটকেরই দেশীয়করণ করাই শ্রেয় মনে করেন।

কিন্তু কেবল এর যুক্তির পক্ষে সওয়াল করাই যেন 'মঞ্জরী...'র উপস্থাপন লেখাটির প্রতিপাদ্য নয়। প্রচলিত স্বভাববাদ থেকে চেকভ যে নিজের মতো একটা স্বভাববাদ এবং প্রতীকবাদের মিলমিশ ঘটিয়ে নতুন পথ খুঁজেছিলেন, সে বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করে পূর্বোক্ত ওই লেখায় বলা হচ্ছে-

> এতে স্বভাববাদের চূড়ান্ত সিদ্ধি ও অনিবার্যতা দুইই এত স্পষ্ট, যে, বাংলা নাটকের সামনে এই নাটককে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা যায়।

মুক্ত অঙ্গনের অপরিসর মঞ্চে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' অভিনয়ের স্মৃতি ইতিহাসে পরিণত হয়ে গেছে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

> একটা দৃশ্য আমরা কোনোদিন ভুলতে পারব না যেখানে ওই বাড়িতে লালিত লালমোহন-যে ভূমিকায় অজিতেশ অভিনয় করতেন-সে শহরে গিয়ে এই পুরো জায়গাটা, জমিটা, বাড়িটা কিনে নিয়ে চলে এসেছে। তার মালিকদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।... নিজের ওই জয়ের, প্রচণ্ড আনন্দের

> একটা উচ্ছ্বাস পুরো শরীরটাতে যেন ছড়িয়ে দিতেন অজিতেশ। তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসত তার উপভাষার সেই সমস্ত সম্পদ... তারপর একটা কান্নায় ভেঙে পড়েন অজিতেশ... ওই উচ্ছ্বাসের বিশালত্ব থেকে কান্নায় ভেঙে পড়া-তার ভাষার শক্তিও যেন কোথাও দীর্ণ হয়ে যায়। সেইটা যখন অজিতেশ তৈরি করেন তখন আমরা ইতিহাসকে দেখি।[৪৮]

এমন কি বিভাস চক্রবর্তী অভিনীত তাপস চরিত্রের অভিনয়েও সেই স্বভাববাদের স্ফুরন দেখতে পান শমীকবাবু-

> বিভাস একটা হোঁচট খেতেন। অনেক আদর্শবাদের কথা, অনেক কিছু বলতেন এই শিক্ষক। কিন্তু বলার পরেই বেরোতে গিয়ে কোথাও হোঁচট খান। নিজের চলাটাই ঠিক নয়। সেটা হঠাৎ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত একটা সময়। ওই ছোট্টো কাজটুকু।[৪৯]

এমন কি, যে শঙ্খ ঘোষকে আমরা অনুযোগ করেছি উৎপল বা অজিতেশ বিষয়ে কিছু না লেখার জন্য, তিনিও এক অবসরে লেখেন-

> ১৯৬৫ সালের সূচনার দিকে একদিন মুক্ত অঙ্গনে দেখতে গিয়েছি নান্দীকারের মঞ্জরী আমের মঞ্জরী। এর আগে এই গোষ্ঠীর নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র দেখে ভালো লেগেছিল, উপস্থাপনা আর ভাবনায় বেশ একটা নতুন স্বাদ মিলেছিল। কিন্তু মঞ্জরী আমের মঞ্জরী তার নাম আর রূপান্তরণ থেকে শুরু করে তার পরিচালনা আর অভিনয় পর্যন্ত একেবারে আপ্লুত করে দিল আমাদের।... অতি-আবেগের বশে আমি বলে ফেলেছিলাম: 'শম্ভু মিত্রও কি পারবেন এরকম?' [৫০]

আমরা এই অধ্যায়ে 'নান্দীকার'-এর আর যে নাটকগুলি নিয়ে কথা বলতে চাইছি সেগুলি হল-

১। যখন একা-আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'রুটস্'-এর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কৃত বাংলা রূপান্তর, প্রথম অভিনয় ১৭ মে ১৯৬৬, ইডেন গার্ডেন্সে যুব উৎসবে।

২। শের আফগান, পিরানদেল্লোর 'এনরিকো দ্য ফোর্থ' অবলম্বনে ১২ জুলাই ১৯৬৬, মুক্ত অঙ্গন, পরে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির জন্য, কলামন্দির, ২৮/০২/১৯৬৯।

৩। 'তিন পয়সার পালা', ব্রেশ্‌টের 'থ্রি পেনি অপেরা', রূপান্তর নির্দেশনা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ এম্পায়ার, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

'যখন একা' নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। 'শের আফগান' নিয়েও নয়। প্রথম নাটকটি অজিতেশ করেন তাঁর ব্যস্ততাবশত স্থির করে নেবার পর যে একটি নাটকে তিনি অভিনয় করবেন না, কেবল বাইরে থেকে পুরোটা দেখে নির্দেশনা দেবেন[৫১]। ফলত, এর নির্দেশনার কাজ অসামান্য হয়েছিল। আবার ওই *যখন একা*-র পরে পরেই চোদ্দজন সদস্য 'নান্দীকার' ছেড়ে দিলেন, গড়ে তুললেন 'থিয়েটার ওয়র্কশপ', তখন খানিকটা দলকে ধরে রেখে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নামালেন 'শের আফগান' [৫২]। দুটি নাটক সম্পর্কেই আমাদের শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

'যখন একা'-র মঞ্চসজ্জা অজিতেশের নিজের ছিল। কেবল অনেকগুলি কাঠের কাঠামো দিয়ে একটা অপরিসর ঘরের মধ্যে মেয়েটি বেশি চলাফেরা করতে পারে না, বাড়ির সবাই তার পরিচিত কম্যুনিস্ট নেতা, যার মতো করে মেয়েটি বলতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে, যাকে কেউ দেখেনি জানে না, যেন বাড়িটাও চেপে রেখেছে মেয়েটিকে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আসে না। তখন মেয়েটি ওই কাঠের কাঠামো ছেড়ে সামনে এগিয়ে আসে, একা হয়ে যায়-নানা অভ্যস্ত কথা বলতে বলতে যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিল, তাকে ফিরে পায়। তখন সে নিজের কথা বলতে থাকে, নিজের কথা। শমীকবাবুর ভাষায় আত্ম-আবিষ্কার, তার সেই প্রজ্জ্বলন্ত মুহূর্ত। তিনি এও দেখান, 'বহুরূপী' 'পুতুল খেলা' নাটকে শেষ অবধি মেয়েটাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল, সেই যেন সমস্ত ছক ভেঙে বেরিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, আমি কথা বলছি এবার। আমার কথা তোমাদের শুনতে হবে। অর্থাৎ কোথাও 'পুতুল খেলা'র একটা পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে 'যখন একা'-য় এসে।[৫৩]

অজিতেশের থিয়েটারের বাস্তববাদ নিয়ে বিশদে আলোচনা অনেকেই করেছেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বেশিই করেছেন। সেই সুবাদে তিনি চলে আসেন 'শের আফগান' বিষয়ে, দেখিয়েছেন, পুরোনো বাংলা থিয়েটারের অতিশয়িত দিকটিকে বুদ্ধি দিয়ে আধুনিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে দূরত্ব রেখে ব্যবহার করা হয়। আমরা যারা 'শের আফগান' দেখিনি,[৫৪] কিন্তু শুনেছি বা দেখেছি খুব জনপ্রিয় নাট্যাভিনয় 'নানা রঙের দিন', তারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারব 'শের আফগান'- এর আন্তররূপ। এক প্রায় বাতিল এবং মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত নটের জীবন সেখানেও। আর 'শের আফগানে'- র অভিনেতা একজন উন্মাদ এবং দার্শনিক।

আপাতত এই অধ্যায় শেষ হবে 'নান্দীকার'- এর বহুল অভিনীত-আলোচিত নাট্যাভিনয় 'তিন পয়সার পালা' দিয়ে। আমাদের এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য নয় গ্রুপ থিয়েটারের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করা, কিন্তু প্রসঙ্গত কিছু ইতিহাসের টুকরো এসেই পড়ছে, আমরা তা এড়াতে পারছি না। আমরা লক্ষ করছি গণনাট্য পেরিয়ে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন মুখ্যত দলপ্রধান (যিনি পরিচালক-অভিনেতা)- এর রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন চিন্তন কল্পনা এবং বোধ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, এবং একটা সময়ে মত ও পথের ভিন্নতায় তার মধ্যে ভাঙন ধরছে। শম্ভু মিত্র ১৯৭১-এর শুরুতে করছেন বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' (২৮/০২/১৯৭১, এই নাটক দিয়ে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর দ্বারোদ্ঘাটন হচ্ছে), ওই বছরের শেষে করছেন বিজয় তেণ্ডুলকারের নাটক 'চোপ্, আদালত চলছে' (এস বি যোশী ও নীতীশ সেনের অনুবাদে, ৯/১২/১৯৭১ কলামন্দির)। এই দুটি নাটকই তাঁর শেষ পরিচালনা। উৎপল দত্তের ইতিহাস আমরা আগেই দেখিয়েছি, 'নান্দীকার'- এও শুরু হয়ে গেছে নানা অছিলায় অন্তর্দ্বন্দ্ব, যার অন্যতম হল 'রঙ্গনা'-য় নিয়মিত অভিনয়। 'বহুরূপী'ও অল্পদিন বিশ্বরূপায় অভিনয় করেছিলেন, সে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, উপরন্তু উৎপল এবং অজিতেশ উভয়ের অভিমুখ পেশাদারিত্বের দিকে, কিন্তু মজা হচ্ছে উৎপল মিনার্ভা

ছাড়ছেন, অজিতেশ তার পরে রঙ্গনায় যাচ্ছেন। এবং এই সত্তরেই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পেশাদার নাট্যাভিনয়ে।

বাংলায় ব্রেখ্‌ট্‌-চর্চা, নান্দীকার ও 'তিন পয়সার পালা'

এই উপশিরোনামের শুরুর অংশ নিয়ে বিশদে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও কয়েকটি মূল্যবান কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। আমরা ব্রেখ্‌টের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই ব্রেখ্‌ট্‌ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কম বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্য গার্ডেনার বইটির সমালোচনা লেখেন, তাঁর ডায়রি থেকে জানা যায়, তিনি রবীন্দ্রনাথের "হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড" পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর বন্ধু ফয়েশ্‌ট্‌ভাঙ্গারের একটি নাটকের পুনর্লিখনের সুবাদে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর যোগ হয়। তার আগে তাঁর নাটক 'ড্রামস ইন দ্য নাইট' প্রযোজিত হলেও তাঁর এপিক নাট্যরীতি তখনও গড়ে ওঠে নি।

চারের দশকে বাংলায় ব্রেখ্‌ট্‌ চর্চা শুরু হলেও তাঁর মৃত্যুর পর (১৪ আগস্ট ১৯৫৬) তাঁর নাট্যদর্শন নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ১৯৩০ সালে লেখা "এক্সেপশন অ্যান্ড দ্য রুল" নাটকটি বাংলায় অনুদিত হয় যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৬১, ১৯৬৭, ১৯৭৮, ১৯৮১-তে নানাজনের দ্বারা, বারবার এবং অভিনীত হতে থাকে। ১৯৬৪-তে উৎপল দত্ত সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি করে স্থাপন করছেন 'ব্রেশ্‌ট্‌ সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। তাঁদের দল 'এল টি জি'-র মুখপত্র *পাদপ্রদীপ* মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই নাম পাল্টে হয়ে যাচ্ছে *এপিক থিয়েটার*। ওই বছরেই ঋত্বিক ঘটক অনুবাদ করছেন 'লাইফ অব গালিলেও' এবং বিষ্ণু দে পরের বছরে 'মাদার কারেজ'। কিন্তু এই দুটি অনুবাদ অভিনয়ের কোনো খবর নেই। ১৯৬৫ এবং ১৯৬৭ সালে শম্ভু মিত্র তাঁর দুটি প্রবন্ধে ব্রেখ্‌টের নাট্যতত্ত্ব এবং নাট্যরীতি বিষয়ে একটি সর্বজনমান্য ধারণা গড়ে তুলতে চাইছেন। প্রবন্ধ ও নাটক ছাড়াও ব্রেখ্‌টের কবিতাও অনুদিত হচ্ছে এই সময় থেকে, এবং ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫ তারিখে

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তরে নির্দেশনায় অভিনীত 'নান্দীকার'-এর 'তিন পয়সার পালা' থেকে শুরু হচ্ছে বিতর্কের আবহাওয়া।[৫৫]

প্রচুর কথা হয়েছে 'তিন পয়সার পালা' নিয়ে। আমরা তার অতি অল্পই সংগ্রহ করতে পেরেছি। এও আমাদের অবাক করেছে যে সমালোচকদের অধিকাংশই ব্রেখ্‌টের নাটক বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন, এবং নান্দীকার ও অজিতেশ কোথায় কতটা সফল অথবা ব্যর্থ হয়েছেন, তার বিচার করেছেন। কেউ আবার 'অপেরা' হিসেবে এর ঔৎকর্ষের বিচার করেছেন। চমৎকৃত হয়েছেন পাশ্চাত্য যন্ত্রের বদলে দেশি ঢোলক সানাই এবং আবৃত্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'হারমনি'। নাটকের প্রস্তাবনায় 'একে একে পুতুলের মিছিলের মত সব কটি চরিত্র দর্শকদের দর্শন' দিয়ে যাওয়া এবং তারপর উনিশ শতকীয় আবহে বিশ শতকীয় সংলাপের মুন্সিয়ানার প্রশংসা হয়েছে, সেইসঙ্গে অভিনয়েরও।[৫৬] *অমৃত* লিখছে- অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণ হল এই যে, তিনি একে একেবারে বাংলা দেশের মাটিতে বসিয়ে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কাহিনীর পোশাক বদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে চরিত্রগুলো দর্শকদেরসামনে তুলে ধরেছেন তারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই কলকাতাকে বেছে নিয়েছিল...একে সঙ্গীত নৃত্য ও কবিতার সহযোগে উপভোগ্য করে তুলেছেন পরিচালক।[৫৭]

এবারে কথা বলা যেতে পারে, ব্রেখ্‌টীয় রূপান্তর নিয়ে। *অমৃত* লিখছে- নাটককে যথাসম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি আনাই ব্রেখ্‌টীয় প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য। অজিতেশবাবু তাকে বাংলা পালা-নাটকের ছাঁচে ফেলে অপূর্ব পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

আসর পত্রিকার সমালোচক ব্রেখ্‌ট্ এবং মূল নাটক সম্পর্কে বিশদ উদ্ধৃতি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিমাত্রায় সফল- অনুসরণের যাঁতাকলে পড়েও মূল নাটকের রসটুকু বাংলায় বিস্বাদ হয়ে যায় নি। দ্বিতীয়ত, ...সম্পূর্ণরূপে 'এপিক থিয়েটারের নাট্য-প্রযোজনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এই 'তিন পয়সার পালা' নাটকেই।[৫৮] শুধু তাইই নয়, বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে 'এপিক থিয়েটারে'র চলনের সঠিক যোগ্যতা নিয়েই 'নান্দীকার' আবার পথ-নির্দেশক হল।

ব্রেখ্‌টের মূল নাটক এবং 'তিন পয়সার পালা'-র তুলনামূলক বিচারে যাবার আগে আমরা একবার দেখে নেব, কোন কোন গুণে 'তিন পয়সার পালা' দর্শককে আকর্ষণ করছে।

১) উপস্থাপনা ভঙ্গি, যথা পর্দা, চলচ্চিত্র, ট্রেডমিল, সাইন বোর্ড, নানা সারগর্ভ বাণী, অথবা প্ল্যাকার্ডে ঘটনাস্থলের নাম লিখে মঞ্চসজ্জা, প্রতীকধর্মী পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার, ছবি ও লেখা, প্রচারপত্রে ইচ্ছাকৃত বানান ভুল, সাতজন সঙ্গীরশিল্পীকে দিয়ে নৃত্য এবং গান সহযোগে রূপকল্প সৃষ্টি, অজিতেশের গীত রচনা, সুর সংযোজনায় চলতি রীতির প্রয়োগ, অসামান্য টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে অপেরার মেজাজ সৃষ্টি, দর্শকদের খোশমেজাজে নাটক দেখবার আরাম দেওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য।

২) 'নান্দীকার'- এর পরিচিত টীম ওয়ার্ক এবং অভিনয়ের অপার মুন্সিয়ানা। বিশেষত যতীন্দ্রনাথের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহীন্দ্রনাথের চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্যোৎস্নার ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয়। আরো অনেকের প্রশংসা হয়েছে যেমন বাঘা (বট) কৃষ্ণ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মালতী লতিকা বসু পারুল কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় লেখেন-প্রথম দর্শনে নান্দীকারের "তিন পয়সার পালা" কে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছি।[৫৯] এই অভিনন্দনের কারণ হিসেবে ওই লেখায় তিনি দেখান যে 'মানুষের অধিকারে'-র পর বাংলা থিয়েটার গতানুগতিক হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ থিয়েটারের আঙ্গিকের নানা সম্ভার এবং কাহিনিকে গৌণ করে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ দর্শনের একটা চেষ্টা ভালো লেগেছিল। অন্য এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, গিরিশযুগে কলকাতার সেই অর্থে 'নাগরিক লোক' জীবনকে যে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে, তার তুলনায় অনেক তীব্র, শাণিত এবং সামাজিক সমালোচনা সহ অজিতেশ তাঁর নিজস্বতায় প্রযোজনার নানান গুণে সেই 'আর্বান ফোক'কে তুলে আনেন এই পালায়।[৬০] কিন্তু ব্রেখ্‌টের নিজের দর্শন দিয়ে বিচার করতে

গেলে অনেক সমস্যা বা বিচ্যুতি তিনি দেখতে পাচ্ছেন এই নাট্যে। রঞ্জন ঘোষ নামে এক সমালোচক এই প্রযোজনার নিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়েও দেখাচ্ছেন, প্রথমত এই নাটকটি ব্রেখ্‌টের এক ত্রুটিপূর্ণ রচনা কেননা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্বনির্ণয়ে তাঁর ত্রুটি ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ, তখন পর্যন্ত মার্কসবাদী দর্শনে তাঁর অধিকার জন্মায় নি।[৬১] প্রসঙ্গটি শেষ করছি ধরণী ঘোষের একটি বিধ্বংসী লেখা থেকে উদ্ধৃত করে, যেখানে শমীকবাবুর লেখাকে অবলম্বন করে আগাগোড়া তিনি ব্রেখ্‌টের নাট্যকে নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন ঢপ কীর্ত্তনের চটকে টিকেট বিক্রি হলেও নবনাট্য আন্দোলন পিছিয়ে যায়।[৬২]

বাংলা থিয়েটারে সমালোচনার এই ভূমিকা নিরূপণ করে অত:পর আমরা সাত এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রবেশ করব।

উৎস ও টীকা

১) গাঙ্গুলি, অমর, ১ জুলাই, ১৯৫৮, *বহুরূপী* ৬, গঙ্গাপদ বসু (সম্পা), পৃ ৩০-৩৫।

২) চক্রবর্তী, বিভাস, ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৫ , *দেশ*, সাগরময় ঘোষ (সম্পা) দ্র 'নাটক নিয়ে', জানুয়ারি ২০০৯, কিশলয় প্রকাশন, পৃ ৮৪-৮৯।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ, ৪/৭/১৯৮৩। এটি নাট্যশোধ সংস্থানে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, প্রকাশ পাবে *সময় নাট্যভাষ* পত্রিকার আসন্ন সংখ্যায়, শেখর সমাদ্দার (সম্পা)।

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্র প্রবন্ধ, ৭ আগস্ট ২০১৬, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৫) দ্র বসু, বিষ্ণু, 'গ্রুপ থিয়েটারের সংজ্ঞা', *নাট্যচিন্তা*, ১৭ বর্ষ, ৬-১২এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৯৯, রথীন চক্রবর্তী (সম্পা)। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৮।

৬) ঘোষ, শঙ্খ, জানুয়ারি ১৯৯৬, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে tussle?', *স্যাস* নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, সত্য ভাদুড়ি (সম্পা)।

৭) ঘোষ, শঙ্খ, ১৯৬৯/২০০৯, 'রাজা:রহস্য ও প্রকাশ্য', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, পৃ ১০৪।

৮) তদেব, পৃ ১১১।

৯) *দর্শক*, ৪র্থ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৩০ জুন ১৯৬৪। দ্রষ্টব্য, *নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার*, আগস্ট ২০০০,' সংসৃতি', দেবেশ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা), পৃ ১৩৩-১৩৫।

১০) তদেব, পৃ ১৩৫।

১১) *পথিকৃৎ*, শারদ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৪, দ্র পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৩।

১২) *গন্ধর্ব*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২, 'রাজা ওয়েদিপাউস ও বহুরূপী'। দ্রষ্টব্য, *অনন্তের ভিতরে ঢেউ*, সমালোচনার নিরিখে বাংলা থিয়েটারের বিবর্তন, জানুয়ারি ২০১৪, দেবাশিস রায় (সম্পা), কালিন্দী ব্রাত্যজন, পৃ ১৪৭-১৫৪।

১৩) Sen, Prof Sunil, 'Raja Oidipous', 1964-65, Uluberia College Magazine। দ্র *নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার*, আগস্ট ২০০০, সংসৃতি, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা) Page-146-150.

১৪) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, *পরিচয়*-এর পাতায় (আষাঢ় ১৩৭৪) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় *বাকি ইতিহাস*-এর একটি বড়ো রিভিউ করেন, যেখানে খুব সূক্ষ্মত প্রযোজনাটি নাটকের অভিপ্রায় থেকে কীভাবে বিচ্যুত হয়, তার পর্যবেক্ষণ আছে। পক্ষান্তরে, *সপ্তাহ* পত্রে (২৭ জুন ১৯৬৯) কেয়া চক্রবর্তী *বর্বর বাঁশি* সম্পর্কে একটি অত্যন্ত পজিটিভ রিভিউ লেখেন। দ্র *বহুরূপী* ৭০, বিশেষ বহুরূপী-প্রযোজনা ২, অক্টোবর ১৯৮৮, কুমার রায় (সম্পা)।

১৫) দ্র *আনন্দবাজার পত্রিকা* ২২ আগস্ট ১৯৬৯। *যুগান্তর* ২৫ আগস্ট ১৯৬৯। দেশ, ৩০ আগস্ট ১৯৬৯। পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ৯৬-১০০।

১৬) উৎপল দত্তর দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়/ সুবীর মুখোপাধ্যায়, পৃ ৩৫।

১৭) তদেব, পৃ ৩৬।

১৮) এই তালিকার জন্য ঋণ সরকার, পবিত্র, 'কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার', *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, মার্চ ২০০৮, দে'জ।

১৯) মুখোপাধ্যায়, অরূপ, ২০১০, *উৎপল দত্ত, জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। পৃ ২৯৬।

২০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মলয় রক্ষিত, পৃ ১৮৯।

২১) মুখোপাধ্যায়, অরূপ, ২০১০, *উৎপল দত্ত, জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ ২৯৭।

২২) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১১ মে ১৯৬২।

২৩) নাট্যশোধ সংস্থান থেকে সংগৃহীত পত্রিকা-কর্তিকা।

২৪) গোস্বামী, আশিস, জানুয়ারি ২০১১, *বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা*, প্রতিভাস।

২৫-২৬) উৎপল দত্তর দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৫, *পর্বান্তর*, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়/ সুবীর মুখোপাধ্যায়।

২৭) লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'কল্লোল', আগস্ট ১৯৬৫, পথিকৃৎ। এর বিপরীতে শৈলেশ চৌধুরি *যুগান্তর* পত্রিকায় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ কলকাতার নাট্যজগতে ঝড় তুলেছে'-এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট লেখেন এবং মিনার্ভার সামনে কংগ্রেসী গুন্ডাদের সঙ্গে লিটল থিয়েটারের সদস্যদের মারামারির প্রসঙ্গ তুলে প্রমাণ করেছেন যে এই নাটক নবনাট্য হয়েও গণনাট্যের কাজ সম্পন্ন করেছে।

২৮) "মিনার্ভায় 'কল্লোল'", ১১/০৬/১৯৬৫, *আনন্দবাজার পত্রিকা*। এর বিরুদ্ধে "জনতা" পত্রিকায় জহিরুল ইসলাম একটি খোলা লেখায় (৩১/০৫/১৯৬৬)

আনন্দবাজারের প্রতিবেদক কমলাকান্ত শর্মা যে ছদ্মবেশী প্রমথনাথ বিশী, সে কথা জানিয়ে বলেন- বুর্জোয়াদের ভাড়াটে গুন্ডা, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পীদের কুখ্যাত অপপ্রয়াস ডিঙিয়ে তাদেরই নাকের ডগায় এক-একদিন তিনটে পর্যন্ত শো দেবার মতো অবস্থা চলেছে। পনের দিন আগে থেকেও টিকিট পাবার যো নেই।

২৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, মলয় রক্ষিত (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পৃ ১৯২-৯৩।

৩০) সরকার, পবিত্র, এপ্রিল ২০০৮, 'লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত তীর', *নাটকের সন্ধানে*, প্রতিভাস, পৃ ৬১-৬৭।

৩১) রাহা, পার্থ, 'মিনার্ভায় 'তীর', ১ জুন, ১৯৬৮, *দ্বন্দ্ব*।

৩২) সরকার, পবিত্র, এপ্রিল ২০০৮, 'লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ-এর মানুষের অধিকারে', *নাটকের সন্ধানে*, প্রতিভাস, পৃ ৬৭-৭৩।

৩৩) *দর্পণ*, শুক্রবার, ১৯শে জুলাই, ১৯৬৮।

৩৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মলয় রক্ষিত, পৃ ১৯৪ ।

৩৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ২০২২, *থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা*, লালমাটি, পৃ ১৩১।

৩৬) *বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ* প্রথম অভিনীত হয় এল টি জি থেকে ১৯৫৬-য় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কিন্তু এই নাটক শ্রী দত্ত আটের দশক অবধি অভিনয় করে গেছেন। তখন তিনি বাংলা-হিন্দি চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা, ১৯৭৪-এ মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তি সামন্তের ছবি *অমানুষ*-এর অভিনয়রীতির ছাপ সেই অভিনয়ে স্পষ্ট দেখেছিলেন এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক, এ কথা

তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯। *তিতাস...* অবশ্য ১৯৬৩-তে অভিনীত এবং মিনার্ভা পর্বের পর আর কখনো অভিনীত হয় নি।

৩৮) এই নাটকের সমালোচনায় লেখা হয়- ...এবং যেহেতু বলবার বিষয়ের উপর গুরুত্ব বেশি, তাই নাটক জমেনি। নাট্যগুণের দিক থেকে উৎপল দত্তের অন্যান্য নাটকের তুলনায় 'লেনিনের ডাক' নীরস। *দেশ*, ৬/১২/১৯৬৯। ৩০) 'রঙ্গমঞ্চ' বিভাগ, *সপ্তাহ*, ২/৮/১৯৬৮।

৩৯) 'রঙ্গমঞ্চ' বিভাগ, *সপ্তাহ*, ২/৮/১৯৬৮।

৪০) জীবনপঞ্জি, *অজিতেশ*, নভেম্বর ২০১৭, ভবেশ দাশ, পরম্পরা প্রকাশন, পৃ ৪০২। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নান্দীকার গোষ্ঠী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বা নির্দেশনায় বেশ কিছু নাটক করেছে যেগুলির খুব বেশি অভিনয় হয় নি কিন্তু প্রযোজনা বা অভিনয়/ রচনাগুণে তারা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল। যেমন প্রথম নাটক 'বিদেহী' (ইবসেনের গোষ্টস-এর রূপান্তর-একটিমাত্র অভিনয় ২১/০৯/১৯৬০) *মা* (নভেম্বর ১৯৬০, জে ব ই ফার্গুসনের 'ক্যাম্পবেল অফ কিলমোর' অবলম্বনে) *সেতুবন্ধন* (৩ ডিসেম্বর ১৯৬০, মৌলিক নাটক) 'নানা রঙের দিন' (চেকভের 'সোয়ান সঙ' বহু অভিনীত সুখ্যাত নাটক)' উইল শেকস্পীয়ারঃ একটি কল্পনা' (ক্লেমেন্স ডেন-এর নাটক অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায়-এর (মতান্তরে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নাটক) ইত্যাদি।

৪১) "নান্দীকার প্রযোজিত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'", আষাঢ় ১৩৭১, *পরিচয়* ৩৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ধ্রুব গুপ্ত।

৪২) নান্দীকার সম্প্রদায় তাঁদের আগের নাটক পিরান্দেল্লোর অতি বিখ্যাত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' মঞ্চস্থ করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পরবর্তী প্রচেষ্টা আর এক বিশ্ববিশ্রুত নাট্যপ্রতিভা আন্তন চেখভের চেরী অর্চার্ডের বঙ্গায়ন 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' সম্বন্ধে রসিকজন সাগ্রহ প্রতীক্ষায়

ছিলেন। অতি প্রাচীন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল। *দর্শক,* ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

৪৩) সান্যাল, গৌতম, নভে-ডিসে ১৯৬৪-জানু ১৯৬৫, *গন্ধর্ব*। দ্র রায়, দেবাশিস, জানুয়ারি ২০১৪, *অনন্তের ভিতরে ঢেউ,* কালিন্দী ব্রাত্যজন। পৃ ১৫৭-১৫৯।

৪৪-৪৫) সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, 'সাক্ষাৎকার', *কথাকৃতি,* পৃ ৫৪, সঞ্জীব রায় প্রমুখ (সম্পা)।

৪৬) সরকার, পবিত্র, বৈশাখ ১৪১২, 'দ্য চেরি অর্চার্ড', *আন্তন চেখভ; বিষয় নাটক,* মৌহারি, সত্য ভাদুড়ী (সম্পাদনা ও ভুমিকা), পৃ ২৪৩।

৪৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, 'নান্দীকার ও নাট্যরূপান্তর', *কথাকৃতি; প্রসঙ্গ অজিতেশ,* সঞ্জীব রায় প্রমুখ(সম্পা), পৃ ৮৫।

৪৮-৪৯) ওই, নভেম্বর ২০১৭, 'অজিতেশকে যেভাবে চিনেছি', *অজিতেশ',* পরম্পরা প্রকাশন, ভবেশ দাশ (সম্পা), পৃ ২০৪-২১২।

৫০) ঘোষ, শঙ্খ, 'সূচনাকথা', নভেম্বর ২০১৭, *অজিতেশ,* পরম্পরা প্রকাশন, ভবেশ দাশ (সম্পা), পৃ ১২।

৫১) অজিতেশ মনে করতেন যে *যখন একা* ওঁর সবচেয়ে ভালো প্রযোজনা এবং তার একটা কারণও বলতেন, অনেক কারণের মধ্যে, যে এই একটা নাটকে উনি অভিনয় করতেন না নিজে। নিজে অভিনয় করতেন না বলেই উনি দেখতে পেতেন সমস্তটা। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, নভেম্বর ২০১৭, 'অজিতেশকে যেভাবে চিনেছি', *অজিতেশ,* পরম্পরা প্রকাশন, ভবেশ দাশ (সম্পা), পৃ ২০৬।

৫২) ...যেমন আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, সেক্ষেত্রে আপনি বাধ্য হয়ে করেছিলেন, আপনি যখন 'শের আফগান' করেছিলেন, আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন যে, একটা হিসেব করা ছিল যে দলটা যদি টোটালি ভেঙে যায় আমি ওইটা ('শের আফগান') করব, কারণ এটা হয়ে যাবে।- বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ, ৪/৭/১৯৮৩। নাট্যশোধ সংস্থানে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, প্রকাশ পাবে *সময় নাট্যভাষ* পত্রিকার আসন্ন সংখ্যায়, শেখর সমাদ্দার (সম্পা)।

৫৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, নভেম্বর ২০১৭, 'অজিতেশকে যেভাবে চিনেছি', *অজিতেশ,* পরম্পরা প্রকাশন, ভবেশ দাশ (সম্পা), পৃ ২০৬। অধিকন্তু দ্রষ্টব্য ২০২২, "থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা", লালমাটি, পৃ ১৫২-৫৪।

৫৪) পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৭-৫৮। এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক দেখেছেন সেই অভিনয় তাঁর ছাত্রবয়সে। ঝাপসা মনে আছে তার সেই অভিনয়ের তীব্রতা। সাক্ষাৎকার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৫৫) বাংলায় ব্রেখ্‌ট্‌ চর্চা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত *বাংলা প্রযোজনা ও অনুবাদে ব্রেশ্‌ট্‌,* আগস্ট ২০২২, 'আধুনিকতা ও বাংলা থিয়েটার', শেখর সমাদ্দার, মৌহারি, পৃ ৪৮৪-৪৯৮ থেকে।

৫৬) *চিত্র ও নাট্যজগৎ,* ৩০ জানুয়ারি ১৯৭০, নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা'।

৫৭) *অমৃত,* ২৩শে মাঘ, ১৩৭৬।

৫৮) *আসর* পত্রিকা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৬৯, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭০।

৫৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, 'তিন পয়সার পালা: কিছু সংশয়ের কথা', এপিক থিয়েটারে মুদ্রিত,। দ্র *থিয়েতারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক,* জানুয়ারি ২০১৩, দেবাশিস রায়, কালিন্দী ব্রাত্যজন, পৃ ২২১-২২৫।

৬০) *আলাপচারিতা,* ০৯/০৯/২০২৪।

৬১) *দর্পণ*, শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭০।

৬২) ঘোষ, ধরণী, একটি চিঠি, দ্র *থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক*, জানুয়ারি ২০১৩, দেবাশিস রায়, কালিন্দী ব্রাত্যজন, পৃ ২২৫-২৩০।

চতুর্থ অধ্যায়

সাতের দশক, মতাদর্শের থিয়েটার ও তারপর

শুরুর কথা

আগের দুই দশকের থেকে এই দশকে যে বদলগুলি ঘটছে, সংক্ষেপে আমরা সেটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমত গণনাট্য কৃষক জীবনের যে বাস্তবিক ছবি তুলে আনতে চাইছিল বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে, তা মুখ্যত অপেশাদার হলেও ভয়ানকভাবে জীবননিষ্ঠ। এর রূপকার বিজন ভট্টাচার্যের কিন্তু গণনাট্যে শেষ অবধি জায়গা হয় নি, 'কবচকুণ্ডল', 'ক্যালকাটা থিয়েটার' গড়ে তাঁকে নিজের থিয়েটারের খোঁজ চালিয়ে যেতে হয়েছে, সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাবের কাছে তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে পরাস্ত হতে হয়েছে।[১] শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছেড়েছেন, নবনাট্য গড়েছেন, কাজ দিয়ে সেই নাট্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে করতে এগিয়েছেন, পেশাদার হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কেবল প্রযোজনার সর্বস্তরে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, ক্রমশ একা হয়েছেন, বিশেষ করে বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি প্রকল্প বিফল হবার পর। কিছুদিন বিশ্বরূপায় অভিনয় করেছে তাঁর সংস্থা, সেখানেও বিফলতাই এসেছে। নিউ এম্পায়ারের যুগ শেষ হয়ে যখন আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের যুগ শুরু হল, নির্দেশনার কাজ শেষ করে সরে গেছেন তিনি। ব্যক্তিগত শম্ভু মিত্রর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা তখন প্রশ্নাতীত, দিল্লির সংস্কৃতি মন্ত্রকের এবং সংগীত নাটক আকাদেমির থেকে অনুদান আসছে 'বহুরূপী'র, সেই অনুদান আসছে 'পি এল টি' -রও, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ১৯৭৪ সালে নিজে হাঁটাহাঁটি করে সেই গ্রান্ট আনছেন 'নান্দীকার'-এ। আগেই আমরা উৎপল দত্ত এবং মিনার্ভার পেশাদার নাট্যের সম্পর্কে বিশদে বলেছি। এই পর্বে সরে আসতে হচ্ছে তাঁকে, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও পেশাদার অভিনেতার সাফল্য পাচ্ছেন। এই পেশাদারিত্ব এবং

সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটারের আলোচনা সুবাদেই আমরা বুঝতে পারব, ক্রমশ এক দিকে গ্রুপ থিয়েটার আরো বেশি করে নিয়মিত থিয়েটারের দিকে যেতে চাইছে, পক্ষান্তরে উত্তর কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে এসে যাচ্ছে 'বারবধূ', 'আসামী হাজির', মিস শেফালি কিংবা সারকারিনায় 'লাজ রাখো' নাটকের চল। আকাদেমি-কেন্দ্রিক গ্রুপ থিয়েটার সম্পূর্ণ তার প্রতিস্পর্ধী হয়ে থাকছে। উৎপল-অজিতেশের প্রভাব ক্রমশ কমছে সে থিয়েটারে। সাতাত্তরে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতিমনস্ক সরকার ওই ব্যবসায়ী থিয়েটারের বিরোধিতা করছেন এবং কিছু নতুন হল বানাচ্ছেন, অধিগ্রহণ করছেন স্টার বা মিনার্ভা থিয়েটার। নাট্যদলের সংখ্যায় বিপুল বিস্ফার ঘটছে, আটের দশকে সরকার নাট্য আকাদেমি তৈরি করছেন। ফলত, নাট্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সাত দশকে 'পি এল টি' – 'নান্দীকার' এবং নতুন 'বহুরূপী' সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদলগুলির অবস্থান একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আমাদের আগে বলা কয়েকটি সূত্র পুনরায় উল্লেখ করতে হবে।

১) শম্ভু মিত্র অন্যতম পরিচালক ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনা *নবান্ন* -এর (অক্টোবর ১৯৪৪) কিন্তু গণনাট্য নিয়ে তাঁর কোনোরকমের বক্তব্য নেই। বরং তিনি 'নবনাট্য'-এ বিশ্বাসী। তিনি স্পষ্টতই বলছেন 'নবান্ন'- এ যা নবনাট্যের সূচনা, 'রক্তকরবী'-তে তার পরিণতি।[২] অর্থাৎ নাট্যবিন্যাসের অভিনবত্ব এবং গণচেতনার নাট্যরূপের দিক থেকে তাঁর কাছে গণনাট্য-নবনাট্যের কোনো পার্থক্য নেই। আবার আগের অধ্যায়ে আমরা উৎপল দত্তের মিনার্ভা-পর্ব ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করে দেখেছি সেখানেও একভাবে সেই চর্চাই ছিল।

২) শম্ভু মিত্র এরপর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিকে চলে গেলেন। 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র' - দুটি ইবসেনের বঙ্গরূপকে বারবার ফিরিয়ে আনা, 'দুটি অন্ধকারের নাটক' বলে ঘোষিত 'রাজা' এবং 'রাজা অয়দিপাউস' অভিনয়, দীর্ঘ আট বছর নির্দেশনার কাজ না করা, এবং 'চাঁদ বণিকের পালা'

লেখা শুরু- সব যাত্রা সেদিকেই ইঙ্গিত করে। অন্যদিকে, 'তীর' নাটকের কারণে উৎপল দত্তের নকশাল রাজনীতিতে যাওয়া, অ্যারেস্ট হওয়া, মুচলেখা দিয়ে বেরিয়ে আসা, 'এল টি জি' থেকে তাঁর বিতাড়ন- তাঁকেও এক অন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় চালিত করছে, যদিও সেকথা তাঁর নাট্যবিশ্বাসে ধরা যাবে না। আগের শিল্পী সমবায় নেই, নতুন করে গড়ে নিতে হচ্ছে পুরোটা। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি এরপর নিজেকে 'রিপিট' করবেন। অন্যদিকে, 'নান্দীকার' ভাঙছে বারবার, অজিতেশকে দল বুঝে বুঝে প্রযোজনা ভাবতে হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে একসময়ে তাঁকেই বেরিয়ে যেতে হচ্ছে।

৩) এই সময়টাকেই আমরা আগের অধ্যায়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' বলে চিহ্নিত করেছি। বিভাস চক্রবর্তীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি যে 'গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন' যখন হল তখন এক ইংরেজি-বিশেষজ্ঞ সমালোচক ঠাট্টা করলেন। উনি বললেন যে নামটা হওয়া উচিত ছিল 'ফেডারেশন অফ থিয়েটার গ্রুপস্'।[৩] ১৯৮৫ সালে বিভাসবাবু এই লেখায় বলছেন, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন- এই কথাটা আজকাল কম ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের ধারণা গ্রুপ থিয়েটারকে আন্দোলন হিসাবে দেখবার চেষ্টা ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু হয় বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর। জরুরি অবস্থা (১৯৭৫)-র সময় এবং তার কিছু আগে থেকে থিয়েটারকর্মীরা ঝুঁকি নিয়ে থিয়েটার করেছেন, তাকে স্বীকৃতি দিতে এবং কার্যত এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই 'ডিরেক্টার্স থিয়েটার'কে "আদর্শ এবং বড় বড় কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হল তখনই"। ক্রমে আন্দোলন কথাটির জায়গা নিল অনুদান এবং সরকারি নানা ছাড়। বিভাসবাবু খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, এই থিয়েটার যেমন নতুন নতুন নাট্যকার ও গুণী কলাকুশলীদের জায়গা করে দিয়েছে, তেমনি রুচিশীল দর্শকমণ্ডলী তৈরি করেছে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের থিয়েটারে আগ্রহী করে তুলেছে। প্রধানত পরিচালকের মাধ্যম হয়ে উঠছে গ্রুপ থিয়েটার। ফলত পুরোনো পেশাদার মঞ্চের 'অ্যাক্টর-ম্যানেজার' প্রথা থেকে মুক্তি পাচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার। এর মোটো হয়ে দাঁড়াচ্ছে- 'শত ফুল বিকশিত হোক'।

৪) আমরা এই অভিসন্দর্ভের শুরুতেই বলেছি, আমাদের অনুসন্ধান মূলত গ্রুপ থিয়েটারের জন্মকাল এবং তার সূচনাসময় থেকে প্রবাহিত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের কথা আলোচনাক্রমে এসে পড়লেও সেখানকার নাট্য-অনুক্রম আমাদের আলোচ্য নয় কোনোভাবেই, ঠিক যেমন 'থার্ড থিয়েটার', 'স্ট্রিট থিয়েটার' ইত্যাদিও তাদের নির্দিষ্ট অভিমুখের কারণে এই আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

পি এল টি

আমরা দেখছি 'এল টি জি' পর্বের শেষে শ্রী দত্ত 'লেনিনের ডাক' নামে আর একটি নাটক করছেন (১৬ নভেম্বর ১৯৬৯)। নাটকটি রচিত হয় লেনিনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। প্রশংসিত এর টেক্সট, অভিনয়ও ভালো, কিন্তু আবহে রুশ সঙ্গীতের প্রয়োগ খুবই সমালোচিত হয়েছে। তাছাড়া 'এল টি জি'-র যে খ্যাতি বিশেষ দৃশ্যনির্মাণে, এখানে তেমন দৃশ্য গ্রামের প্রান্তে ট্রেন থামিয়ে কর্ণেলের দলবলকে হত্যা করা, দৃশ্যটি শব্দ ও ছায়াপ্রয়োগের ব্যর্থতায় আশানুরূপভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।[৪] 'পি এল টি' শুরু করে উৎপল দত্ত তিনটি নাটক একসঙ্গে করছেন, 'সূর্যশিকার' (২৮ মার্চ ১৯৭১/ রবীন্দ্রসদন), 'ঠিকানা' (২ আগস্ট ১৯৭১/ আকাদেমি) এবং 'টিনের তলোয়ার' (১২ আগস্ট ১৯৭১ রবীন্দ্রসদন)। এদের মধ্যে 'সূর্যশিকার'-এ মুখ্য চরিত্রে তিনি নেই, হয় গ্রীবের চরিত্রে অসিত বসুর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে, শ্রী দত্ত নিয়েছেন কুটিল, আত্ম-অভিমানী সমুদ্রগুপ্তের ভূমিকা। আগেই আমরা দেখিয়েছি, 'মানুষের অধিকারে'-র পর থেকে শ্রী দত্তের অভিনয়ের প্রশংসা বেড়েছে। সমালোচক লিখেছেন-

> তিনি যে বড় অভিনেতা তার পরিচয় নানাভাবেই পাওয়া যায়-কখনও স্বরক্ষেপ ভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনে, কখনও-বা হয়ত একটি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিতে অথবা আচরণে।[৫]

তাঁর অভিনেতা সত্তার চূড়ান্ত একটা বিস্ফোরণ ঘটছে, যখন 'টিনের তলোয়ার'- এ তিনি কাপ্তেনবাবু বেণিমাধবের ভূমিকা নিচ্ছেন। এই নাটকে ইতিহাসের চিত্রণ কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যত প্রশ্নই উঠুক, বাংলা নাটকের ইতিহাসে এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিঘাত এখনো প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। এই নাটক নিয়ে উচ্ছ্বসিত পি এল দেশপান্ডে, অশোক ঘোষাল, অনল গুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উচ্ছ্বসিত দর্শক কবিতা লিখে ফেলছেন এই নাটকের প্রতিক্রিয়ায়। তাঁদের অভিমত,

> অনেক দিন রঙ্গমঞ্চে এমন সামাজিক কশাঘাত দেখিনি, অশ্লীল কথাগুলি অভিনয়ের আশ্চর্য নৈপুণ্যে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে, সেগুলি কোনোও রসবোধকে বা রুচিবোধকে ব্যাহত করে নি।

এই নাট্য পরিবেশনার মধ্যে যে আঙ্গিকের চমক আছে, তা একে জনপ্রিয় করেছে কিন্তু এ নাটক আঙ্গিকসর্বস্ব নয়,

> সংলাপের আপাত বিচ্ছিন্ন টুকরো নিয়ে গড়ে উঠতে পারে যে জীবন-দর্শনের কাব্য, তারই নাম 'টিনের তলোয়ার'...নাটকের মূল ব্যাপারটাই তার বক্তব্য বা বিষয়বস্তু। এবং বক্তব্যের প্রয়োজনে আঙ্গিকের প্রয়োগ। আঙ্গিক আগ বাড়িয়ে কথা কয়নি কোথাও।[৬]

'টিনের তলোয়ার'- এর পরেও উৎপল দত্ত পরবর্তী তেইশ বছরে অন্তত সাতান্নটি নাটক, পথনাটক এবং যাত্রাপালা লেখেন, পুনরাভিনয় করেন 'ম্যাকবেথ', 'বিসর্জন' এবং গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি অবস্থা-উত্তর অবস্থানের সঙ্গে বিরোধে-বিতর্কে 'দু:স্বপ্নের নগরী'[৭] (১৬/০৫/১৯৭৪) 'শ্রীমতীর বিচার' (২৩/০২/১৯৮২) এবং *দৈনিক বাজার পত্রিকা* (১১/০২/১৯৮৯ পুরোনো *সাংবাদিক* নাটকের নব্যরূপ) যতটা রাজনৈতিক কারণে আলোচিত হয়েছে, ততটা নাট্যগুণে নয়। অন্যান্য অনেক নাটকেই উৎপল দত্তের আগেকার অভিঘাতের তীব্রতা কমে গিয়েছিল, যদিও 'ব্যারিকেড' (২৫/১২/১৯৭২) নাটকে শ্রী দত্তের

মধ্যমঞ্চে একটি রস্ট্রামের ওপরে বিচারকের ভূমিকায় অনুত্তেজিত অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর কাছে আমরা একথাও জানতে পাই যে এরই কাছাকাছি সময়ে উৎপল দত্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন সিনেমায় এবং অসিত বসু এবং 'সূর্যশিকার' -এর ইন্দ্রানী বা 'টিনের তলোয়ার'- এর ময়না ছন্দা চট্টোপাধ্যায় যাত্রায় চলে যান। অর্থাৎ সেই চিরাচরিত পেশা আর নেশা/ কমিটমেন্টের সংঘাত-শ্রী দত্তের ভাষা ধার করেই বলতে হয়, আর মতাদর্শ দিয়ে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। ফলত এও শোনা যাচ্ছিল, আর উৎপল দত্ত বা 'পি এল টি' -র নাটক দেখা যাচ্ছে না, বড্ডো 'রিপিট' করছেন তাঁরা নিজেদের।[৮] আমরা 'পি এল টি'- র আলোচনা শেষ করব নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রযোজনার আলোচনা দিয়ে।

'টিনের তলোয়ার'- এর শেষে কাপ্তেনবাবুরা যে নাটক তুলে নেন, সাত বছর পরে সেই নাটক অভিনীত হয় 'তিতুমীর' (২৬ জানুয়ারি ১৯৭৮) রবীন্দ্র সদনে। এ নাটকের টিমওয়ার্ক যথারীতি প্রশংসিত হয়েছে *গণশক্তি* পত্রিকার সমালোচকের কাছে। মঞ্চে বাঁশের কেল্লার নির্মাণকে তিনি বলছেন কল্লোলের পর এ ধরণের মঞ্চসজ্জা সম্ভবত আর দেখা যায় নি,[৯] কিন্তু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাঙ্গীণ প্রশংসা করতে পারেন নি, এপিক থিয়েটারেই তিনি লিখেছেন 'তিতুমীর প্রথম দর্শনে'।

> মঞ্চের পিছন থেকে সামনা সামনি প্রবেশ প্রস্থানের 'সেরিমোনিয়াল' মজায় নাট্য নির্দেশনায় উজ্জ্বল কল্পনাশক্তির প্রমাণ, তার শৈথিল্য ধরা পড়ে একাধিক অভিনেত্রীদের বড় শহুরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, মেয়েদের নাচের আড়ষ্ট, অসম্মেলক ভঙ্গিবিন্যাসে, প্রদীপের বদলে বৈদ্যুতিক প্রদীপের ছেলেমানুষি ফাঁকিতে, দুটি হত্যার দৃশ্য বড় সাজানো, বড় চেনা, গোঁজামিল স্টাইলাইজেশনে।[১০]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন যে 'ব্যারিকেড' থেকে 'পি এল টি'- তে শুরু হয়ে যায় a kind of political education - অতীত ইতিহাসের একটা period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা।[১১] তিনিই আবার পূর্বোক্ত লেখায় দেখাচ্ছেন, যাত্রায় 'মুক্তিদীক্ষা' এবং 'তিতুমীর'- এর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে,- ক্লাইম্যাক্স থেকে ক্লাইম্যাক্স উত্তেজক ভঙ্গি এড়িয়ে তিনি শান্ত মেজাজে ইতিহাস চর্চা করতে

পারেন। যখন যাত্রায় নাচ গান সস্তা রসিকতা রোম্যান্টিক রাজনীতি সব কাজে লাগানো হচ্ছে তখন নাটকে ইতিহাস ও রাজনীতি পরিবেশন করে দর্শক আকর্ষণ করছেন। দর্শক আকর্ষণ করতে গেলে সমাজবোধ শিল্পবোধ জলাঞ্জলি দিতে হবে। এই অসৎ স্বত:সিদ্ধটি মিথ্যা প্রমাণ করছেন উৎপল দত্ত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির লড়াইটা তখন চলছে[১২]। সেই পরিপ্রেক্ষিতে *গণশক্তি* -র সমালোচক প্রশ্ন তুলছেন, কেন 'তিতুমীর'-এর মতো নাটক আকাদেমি রবীন্দ্র সদনের বাইরে পৌঁছতে পারে না? তাঁর যুক্তি এই, পয়সা না হলে দলগুলি বাঁচতে পারে না। এটা যেমন ঠিক তেমনি অল্প পয়সায় বেশি মানুষ দেখতে পেলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাফল্যটা বাস্তবমুখী হয়ে উঠতে পারে।

যে রাজনৈতিক শিক্ষার কথা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সেই জায়গা থেকেই স্তালিনের জন্মশতবর্ষে 'পি এল টি'- র নাটক 'স্তালিন' ১৯৩৪ (১৭ নভেম্বর ১৯৭৯/ আকাদেমি) কিংবা কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে 'শৃঙ্খল ছাড়া' (১৭ নভেম্বর ১৯৮৩) অথবা ফরাসি বিপ্লবের দ্বি-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'নীল সাদা লাল' (১৩ এপ্রিল ১৯৮৯/ রবীন্দ্র সদন) প্রযোজিত হয়েছে। এই নাট্যগুলির প্রযোজনা নিয়ে যথারীতি একই ধরণের সমালোচনা হয়েছে কিন্তু আমরা উৎপল দত্তের যে একক ব্যক্তির মুখ ঝলসে উঠতে দেখতে পাই, তার সাক্ষাৎ মেলে যথাক্রমে 'দাঁড়াও পথিকবর' (৪ ডিসেম্বর ১৯৮০) ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট-শ্রী দত্তের পুনরায় এবং শেষ আংশিক পেশাদারী উদ্যোগ) এবং 'আজকের সাজাহান' (২১ এপ্রিল ১৯৮৫?/ ওই মঞ্চ) নাটকে। কিন্তু 'দাঁড়াও পথিকবর', 'টিনের তলোয়ার' নয়, ফলত এই নাটকে মাইকেলের যে ব্রিদ্রোহী বিপ্লবী মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে তা স্বভাবতই নানা বিতর্কের মুখে পড়েছে। আমরা মনে রাখছি *গিরিশ মানস* [১৩] বইটি রচনার সুবাদে উৎপল দত্ত অনেক বেশি বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু যে একাকিত্ব মাইকেলের চরিত্রে ছিল, তার গভীরতা প্রকাশে ১৯৫০ সালে মধু বসুর ছবিতে মাত্র একুশ বছরের যুবক উৎপল দত্ত হয়তো সক্ষম ছিলেন না, তা তার সমস্ত ঐতিহাসিক মাত্রা নিয়ে উপস্থিত ছিল

এই নাট্যে, যখন তাঁর বয়স একষট্টি বছর। এরুইন পিস্‌কাটরের ভাবশিষ্য, ব্রেশ্‌টের সমগোত্রীয় উৎপল দত্ত এর মঞ্চসজ্জায় ব্রেশ্‌টীয় এবং তাঁর নিজের শৈলী দুটিই প্রয়োগ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি নিজেই বলেছেন, 'আজকের সাজাহান' নাটকের বক্তব্যটা দর্শক 'অনুধাবন করতে পারেন নি'।[১৪] আমরা আর বিশদ ব্যাখ্যায় যাব না, এই দুই নাট্যে অভিনেতা উৎপল দত্তের সম্পর্কে দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

দাঁড়াও পথিকবর

তিনি যে কতবড় অভিনেতা সেই প্রতিভার মাপ কখনই চলচ্চিত্রে বা সাধারণ নাটকের চরিত্রে পাওয়া যায় না...মধুসূদন দত্ত কখনই উৎপল দত্তের মতো অভিনয় করতে পারতেন না। (দেবাশিস দাশগুপ্ত, ১/৩/১৯৮১, *দেশ*)

আজকের সাজাহান

নাট্যকার উৎপল দত্ত এই নাটকের তাঁর সৃষ্ট 'কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী' চরিত্রের মাধ্যমে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই গৌরবময় অতীত, সেদিনের মঞ্চশিল্পীদের মঞ্চের সঙ্গে একাত্মতা, অভিনয়ে চর্চার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং মঞ্চ ও সমাজ দুই পরিবেশেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিল্পী সত্তা বিকাশের উজ্জ্বল ইতিহাসটিকে তুলে ধরে পূর্বসূরীদের প্রতি উত্তরসূরীর অকপট শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতার সাক্ষর রেখেছেন। (*গণশক্তি*, ১৩/৪/১৯৮৭, মধু গোস্বামী)

এই প্রতিবেদক চেয়েছেন, এরপর তিনি গিরিশচন্দ্র আর শিশিরকুমারকে নিয়ে নাটকের কথা ভাবুন- নয়তো তিনি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবেন।

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, মিনার্ভা পর্বে রাজনৈতিক থিয়েটার করেও পেশাদার থিয়েটার চালিয়ে যাওয়া ('কল্লোল চলছে, চলবে' শ্লোগান স্মরণীয়) উৎপল দত্ত যখন 'টিনের তলোয়ার' নাটকে বেণীমাধবের মধ্য দিয়ে উচ্চারণ করবেন-

আমি আসলে বড় একা। কেউই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন অবজ্ঞার মতন একা। (*টিনের তলোয়ার*, দৃশ্য আট, পৃ ১২৩, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭৩, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ)

নান্দীকার এবং অন্যরা

থিয়েটারের আত্মমর্যাদা, নিজেরাই নিজেদের কাজকে একটা সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, অথবা থিয়েটারকে পেশাদার করে তোলা- ইত্যাদি বিষয়ে অজিতেশের অদম্য আগ্রহ থেকে তাঁকে আমরা দেখি, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তিনি বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির জন্য 'মুদ্রারাক্ষস' নির্দেশনা করছেন এবং পরের বছর ১৯৭২-এ একই তারিখে রঙ্গনায় (বস্তুত এই মঞ্চ ভাড়া করা এবং সেখানকার যাবতীয় মর্যাদাহানির অভিজ্ঞতা থেকেই 'নান্দীকার'- এ অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত হয়। এর মধ্যেই আমরা তাঁকে 'শাহী সংবাদ' (স্ট্রিন্ডবার্গের 'এরিক ফোরটিন' অবলম্বনে, রঙ্গনা, ২ ফেব্রু ১৯৭৪) মঞ্চস্থ করতে দেখি, ওই বছর ১৫ অক্টোবর অভিনীত হয় 'ভালো মানুষ' (ব্রেশ্‌টের 'গুড উওম্যান অব সেৎজুয়ান' অবলম্বনে)। জরুরি অবস্থার বছর, ১৯৭৫-এ 'নান্দীকার' অভিনয় করে জঁ আনুই-কৃত অনুবাদে সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে'। নাটকটি অভিনীত হয় আকাদেমি মঞ্চে। নির্দেশনা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এরপর উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৭-এর ১০ মার্চ পুরোদস্তুর রুদ্রপ্রসাদের রূপান্তর এবং নির্দেশনায় আকাদেমিতে অভিনীত হচ্ছে পিটার টার্সনের 'জিগ্যার জ্যাগার' অবলম্বনে 'ফুটবল'। অজিতেশ সেই নাটকে নিছক অভিনেতা।

'নটী বিনোদিনী' প্রথম অভিনীত হয়েছিল ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ, নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির নাট্যোৎসবে, পরের দিনই এটি রঙ্গনায় মঞ্চস্থ হয়। রুদ্রপ্রসাদ বলেছেন, এই সময়ে অজিতেশ

নানাকিছু নিয়ে বিপর্যস্ত, তারই মধ্যে যখন এসে নির্দেশনা এবং নিজে গুর্মুখ রায়ের চরিত্র করলেন, তখন তাক লাগিয়ে দিলেন।[১৫]

প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকা নাটমঞ্চের উৎসবে দেখা অভিনয়ের আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি সাধারণ পয়েন্ট তুলেছেন।

১) নান্দীকারের মৌলিক নাটক।

২) বিনোদিনীকে নিয়ে নাটককার চিত্তরঞ্জন ঘোষ লিখতেই পারতেন একটি আবেগঘন নাটক, কেননা বিনোদিনীর স্বল্পকালের নটীজীবনে নাটকীয়তার অভাব ছিল না। তা না করে কেন মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁকে মঞ্চ ছেড়ে যেতে হয়েছিল, তার অন্তর্বয়ান এই নাটক। অভিনব।

৩) উপস্থাপনার অভিনবত্ব। স্বয়ং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এর প্রশংসা করেছেন। সমালোচকেরা কেউ এর মধ্যে ব্রেশ্‌টের ব্রেগর্শঁ অপেরা রীতির ছায়া দেখেছেন, কেউ কেউ যাত্রাভিনয়ের ধারা লক্ষ করেছেন। সূত্রধার মঞ্চে অতীতকে ডেকে আনেন, সেই অতীতের প্রতিনিধি হয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র। নট নটীরা মঞ্চের পিছনের প্রায়ান্ধকার অংশে বসে থাকেন, একটি চেয়ার ছাড়া মঞ্চে আর কিছু নেই। কেবল আলোতে আবহে যন্ত্রানুষঙ্গে এক এক অভিনেতা সামনের আলোকিত অংশে এসে 'বাঞ্ছিত গতিবেগে' দৃশ্যের পর দৃশ্যকে সংযুক্ত করেন।

৪) মুখ্য চরিত্রে মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয়, এবং গুর্মুখ রায় রূপে নির্দেশকের নিজের অভিনয়।[১৬]

পরবর্তী নাটক 'শাহী সংবাদ'। *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে* 'By Our Drama Critic' নামে সমালোচনা লিখতেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৭] স্ট্রিন্ডবার্গের 'এরিক দ্য ফোরটিন', যার উল্লেখ ছিল না বলে তিনি অনুযোগ করেন, সেই নাটক অবলম্বনে বর্তমান নাটকটি যে তৎকালীন রাষ্ট্রকাঠামোর অবস্থা চলছিল তার বিরোধিতা করতে চাইছে। কিন্তু সে কাজ আওরঙ্গজেবের প্রপ্রৌত্র ফররুক-সিয়ারের

রাজ্যকালের অস্থিরতা ও চক্রান্ত-প্রতিচক্রান্তের কাহিনিতে সফল হয়নি বলে মনে করেছে *আনন্দবাজার,* সূত্রধার চরিত্রটিকে তাদের নিতান্ত 'গিমিক' বলে মনে হয়েছে। এই ভূমিকায় অভিনেতা পরিমল ভট্টাচার্য যে দর্শকদের মনোযোগ এবং হাততালি পান, তাও শিল্পসুলভ মনে হয় নি সমালোচকের। শীলভদ্র নামের সমালোচক *অমৃত* পত্রিকায় নাটকটির সামগ্রিক প্রশংসাই করেছেন।[১৮] *দেশ* পত্রিকায় প্রবোধবন্ধু অধিকারীর লেখা থেকে আমরা কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র থেকে শুরু করে শের আফগান, যখন একা এবং তিন পয়সার পালার স্রষ্টাকে এ প্রযোজনার কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? তবে কি বলব নান্দীকার আপোষ চান? অবশ্য না চাইলেই বা দুই চোখ ভরে সর্বত্র শোষণের সর্ষেফুল দেখার প্রবণতা ওঁদের পেয়ে বসবে কেন?[১৯] আগাগোড়া বিধ্বংসী এক লেখা।

'নান্দীকার'- এ এই সময়ে দুটি ঘটনা ঘটছে। আমরা জানি না, 'পি এল টি' যে তিনটি নাটক একসঙ্গে অভিনয় করতে চাইছে, 'সূর্যশিকার', 'ঠিকানা' এবং 'টিনের তলোয়ার'- এর পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আর্থিক সহায়তার প্রকল্প ছিল কিনা। কিন্তু 'বহুরূপী' এবং 'নান্দীকার' এই অর্থ পেত। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় সেই পরিসংখ্যান দিয়েছেন আমাদের।[২০] রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তও পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি নিজে দিল্লি গিয়ে হাঁটাহাটি করে সেই গ্রান্টের ব্যবস্থা করেন।[২১] শমীকবাবু এই অর্থ নানাদিক থেকে নবনাট্যের চারিত্র্য নষ্ট করছে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আবার এই একই সময়ে 'নান্দীকার' রঙ্গনায় পেশাদার হয়ে উঠতে চাইছে কেননা গ্রান্টের শর্ত ছিল সংস্থাকে পেশাদার হয়ে উঠতে হবে। গ্রান্ট বহাল রাখার জন্য তিনটি নাটক একসময়ে করতে হত, এবং তা 'নান্দীকার'- এর সেই তিনটি নাটক হল 'শাহী সংবাদ', 'ভালো মানুষ' এবং 'আন্তিগোনে'।

যে কেয়া চক্রবর্তী এতদিন 'নান্দীকার'- এ ছোটো ছোটো চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তার প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখা গেল 'ভালো মানুষ' এবং 'আন্তিগোনে'- এই দুই নাটকে। *আনন্দবাজারের* নাট্য সমালোচক লিখছেন-

> ভালো মানুষ রঙ্গনায় আসর জমিয়ে দিয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টার এই নাটক যদি দর্শকদের মন পেয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছে প্রয়োগনৈপুণ্য এবং প্রধানত শিল্পীদের অভিনয়ের গুণ।[২২]

রুদ্রপ্রসাদ এবং অজিতেশ ছাড়াও ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে কেয়া চক্রবর্তীর। এই নাটকে শান্তা ও কল্পিত পুরুষচরিত্র শান্তাপ্রসাদ এই অত্যন্ত সৎ একনিষ্ঠ শিল্পীকে এতখানি বদলে দেয় যে তিনি কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নান্দীকারের সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রেও তাঁর গুরু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তকেই তিনি সামনে রাখেন।

দেশ পত্রিকা লেখে, ব্রেশ্‌টের এই 'প্যারাবল্ প্লে'-র যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু নান্দীকারের এই নতুন উপহারের প্রয়োগ যেন এক বৃন্দবাদন।[২৩] সেই সময়ের বিতর্কিত পেশাদার মঞ্চের নাটক 'বারবধূ'- র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল এই নাটককে, খুব আক্রমণ করা হয়েছিল *কৃত্তিবাস* পত্রিকার পাতায়। 'দর্শন দত্ত' এই ছদ্মনামে 'ভালোমানুষ হওয়া অসম্ভব?' এই শিরোনামে 'নান্দীকার'- এর প্রধান শিল্পীদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।[২৪]

প্রচুর পত্রপত্রিকায় 'ভালো মানুষ'- এর সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র 'এন্টারটেইনমেন্ট' দেখতে পেয়েছেন এই নাটকে, কেউ কেউ আবার কলকাতার থিয়েটারে রুচির অবক্ষয়ের মধ্যে এই নাট্যে আশার আলো দেখেছেন। নাটকটি জনপ্রিয় হবার ফলে ধারদেনা মিটিয়ে 'নান্দীকার' কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছে-এ কথা দর্শন দত্তকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন।

রঙ্গনার সঙ্গে 'নান্দীকার'- এর মতবিরোধ এবং 'নান্দীকার'- এর পক্ষে শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত বিজন ভট্টাচার্য জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখর মধ্যস্থতা ইত্যাদি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু

যা অবশ্যই লক্ষ করার মতো যে প্রথম নির্দেশনার দায়িত্ব পাচ্ছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যে ‘আন্তিগোনে’ নাটকে, সেখানে স্বয়ং অজিতেশকে নিয়ে তিনি খুব সম্মানজনক মনোভাব দেখাচ্ছেন না। এই অভিনয়ের আগে অজিতেশের একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেইটার দোহাই পেড়ে সেনগুপ্ত দেখান, অজিতেশ সংলাপ মুখস্থ করতে পারছিলেন না, ছোটো একটা খাতায় টুকে নিয়ে নাকি মঞ্চে যাচ্ছিলেন...ইত্যাদি। একই সঙ্গে সমালোচকরা অজিতেশ-কেয়ার ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন সেই উল্লেখ করেও তিনি বলেন একেবারে লজ্জা পাবার মতো ব্যাপার।[২৫] আমরা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও এটুকু বলতে পারি, প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েও যেন খুশি ছিলেন না তিনি, কারণ বোঝা যাচ্ছিল না-রঙ্গনা নিয়ে অশান্তির মধ্যে ‘আন্তিগোনে’ বন্ধ করে দেবার প্রসঙ্গও এসে পড়ছিল। এরপর ‘নান্দীকার’- এ অজিতেশ আর দুটি নাটকে ছিলেন, যার একটি তাঁরই লেখা ‘সওদাগরের নৌকা’ যে নাটক সত্যি সত্যিই একটি অভিনয়ের পর (৩০ অক্টোবর ১৯৭৬) বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ছ’মাস পরে নেমেছিল ‘ফুটবল’ (১০ মার্চ ১৯৭৭) এবং ‘পাপ পুণ্য’ (২৯ জুন ১৯৭৭, ‘নান্দীকার’- এর জন্মদিনে)- এও একটাই অভিনয়। এরপর কেয়া চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যু (১২ মার্চ ১৯৭৭) ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) ‘নান্দীকার’ ত্যাগ। ‘নান্দীকার’ পরে ‘আন্তিগোনে’ রিভাইভ করে, মূল দুটি চরিত্রে আসেন রুদ্রপ্রসাদ নিজে এবং স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীতে যিনি সেনগুপ্ত হন, উনিশটি অভিনয় চলে। অজিতেশ চলে যাবার পরে নানা পর্যায়ে ‘ফুটবল’ নাটকেরও অনেক অভিনয় হয়েছে। এমন কি নতুন প্রজন্মের অভিনেতা গৌতম হালদার ‘হরি’র চরিত্রে এবং দেবশংকর হালদার জামাইবাবু ও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন।[২৬]

‘নান্দীকার’ প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আমরা একটি জরুরি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। শম্ভু মিত্র ‘বহুরূপী’তে নেই, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ‘নান্দীকার’- এর বাইরে। অথচ একদা বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্যোগে ১৯৭২-৭৩-এ সমবেত অভিনয় হয়েছিল

বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', চাণক্যের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র, নির্দেশনা এবং চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাত্যায়ন কুমার রায় রাক্ষস রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কিন্তু ১৯৭৯ সালের শুরুতেই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পুনরায় 'মুদ্রারাক্ষস' করেন 'নান্দীকার'- এর ব্যানারে, চাণক্য সেই শম্ভু মিত্র। ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাবার পর তাঁর খুব খ্যাতি সেইসময়, মাত্র কয়েক মাস আগে ১৬ জুন ১৯৭৮-এ তিনি 'বহুরূপী'তে শেষ অভিনয় করেছেন 'দশচক্র', তার পরেই 'মুদ্রারাক্ষস'। একই প্রযোজনায় অন্য নির্দেশকের নাম থাকায় তাঁর আপত্তি হল না। অথচ তিনি ছেড়ে যাবার পরেও 'বহুরূপী' সম্পর্কে তার ইতিহাসকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> কিন্তু তিনিই তো শিখিয়েছিলেন ভালোবাসতে এই থিয়েটারকে—যেখানে তুচ্ছ হয়ে যাবে ব্যক্তিগত সব অভিভব, শোক, দুঃখ, আনন্দ। গত এক দশক ধরে তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়েনি বহুরূপীর মহলাকক্ষে বা মঞ্চে; কিন্তু আজও প্রতি সন্ধ্যায় যেন তাঁরই নানা উৎসাহ, নির্দেশ, নিষেধ বা সুভাষিত মন্ত্রের মতো স্মরণ করেন বহুরূপী ... বহুরূপী থেকে তিনি দূরে স'রে গেলেও, তাঁরই শিল্পের শিক্ষা, জীবনের পাঠ সংহত ও সৃজনশীল করে রেখেছে বহুরূপীকে।[২৭]

সেই মানুষের কাছে এই আচরণ কাম্য ছিল কি? নান্দীকারের 'মুদ্রারাক্ষস' বিষয়ে খুবই আকর্ষক কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। শম্ভু মিত্রের প্রবল খ্যাতির দরুণ এই অভিনয়ে 'নান্দীকার' বিপুল সাড়া পায়, তিনদিন আগে কাউন্টারে লাইন পড়ে যায়। প্রতিবেদক লেখেন—

> ইদানিংকার নাট্যামোদী যুবজন, যারা শম্ভু মিত্রের গল্পই শুনেছেন,অভিনয় দেখেন নি, তাদের কাছে শম্ভু মিত্রের নামটিই এক বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে।[২৮]

এই প্রতিবেদনে হেডিং করা হয়েছে—রুদ্র রাক্ষসের হাতে অন্য থিয়েটারের অমাত্য দাসত্ব অর্পণ। এবং শেষে লেখা হয়-

> মনে হয় কৌটিল্য-শম্ভুর প্রস্থানান্তে রাক্ষস-রুদ্রপ্রসাদের কণ্ঠে ভরতবাক্য উচ্চারণ কি বিশেষ কোনো ইঙ্গিত বহন করছে! লৌকিকার্থে শম্ভু ও রুদ্র তো মোটামুটি একার্থবাহী-শম্ভু-চাণক্য কি রুদ্র-রাক্ষসের হাতে বাংলার অন্য থিয়েটারের অমাত্য দাসত্ব অর্পণ করে যেতে চান।

এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথায় আমরা যাব, তার আগে বলি, *আনন্দবাজার* পত্রিকার প্রতিবেদকও শম্ভু মিত্রের মঞ্চাবির্ভাব এবং সমগ্র অভিনয়ের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে গেছেন, লিখেছেন—

> বছর সাতেক আগে নির্বাচিত শিল্পীসমবায়ে অভিনীত অন্য মুদ্রারাক্ষস নাট্যের চাণক্য চরিত্রে শম্ভুবাবু আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এবার সেই একই চরিত্রের রূপায়ণ আমাদের মুখের 'রা' কেড়ে নিয়েছে।[২৯]

পরিচয় পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে শ্রীমতী অরুণা হালদার বিশাখদত্তের মূল নাটকের প্রসঙ্গ তুলে 'নান্দীকার'-এর এই প্রযোজনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। লেখাটি বেরোয় *পরিচয়*- এর শারদীয়া সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর ১৯৭৯, পৃ ৩৩৬-৩৪২)। ডিসেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যায় রুশতী সেন (পৃ ১১৫-১১৭) তার বিরুদ্ধে এক চিঠি লেখেন। তাতে স্পষ্টভাষায় জানান যে দলগত অভিনয় বলে এই প্রযোজনায় কিছুই ছিল না-

> 'নান্দীকার'-এর 'মুদ্রারাক্ষস'-এ শম্ভু মিত্রের অবস্থাটা যেন লিলিপুটের দেশে আগত গালিভারের মতো। তাই বিরাট অভিনেতাকেও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে যথেষ্ট অস্বস্তি হচ্ছিল, প্রয়োজন হচ্ছিল অতি অভিনয়ের।

থিয়েটার ওয়র্কশপ

'নান্দীকার' থেকে একদল তরুণ তরুণী বেরিয়ে এসে ১১ জুলাই ১৯৬৬ সালে এই দলের জন্ম দিলেন। এঁদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা শন ও'কেসির জুনো অ্যান্ড দ্য পিকক থেকে 'ছায়ায়

আলোয়'। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে এদের আরো গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রযোজনা হল 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার' এবং 'মহাকালীর বাচ্চা'। 'ছায়ায় আলোয়'- এর আগে তাঁরা বিভাস চক্রবর্তী লিখিত 'ভিয়েতনাম' নামে একটি নাটক করেন, সেটিও প্রশংসিত হয়েছিল। *দৈনিক কালান্তরে* লেখা হয়েছিল-

> অধুনা নাটকের বাজারে ভিয়েতনামের নামে যে বীভৎসরস ছড়ানোর চেষ্টা চলছে, এটি সেক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম, বীভৎসরস নেই কোথাও, রচনায় অপূর্ব সংযম, সুন্দর স্বাভাবিক সংলাপ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা হোলো চেষ্টা করা হয়েছে সাধারণ মার্কিন সৈন্যকে বোঝবার। যুদ্ধটা যে তাদের কাছেও কাম্য নয়, তারাও যে বাধ্য হয়েছে এই ঘৃণ্য যুদ্ধে আসতে, সে কথা নিজেরা বুঝতে এবং দর্শককে বোঝাতে চেয়েছে থিয়েটার ওয়র্কশপ।[৩০]

ওয়র্কশপের 'ছায়ায় আলোয়' নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই তারা গ্রুপ থিয়েটারের এক আদর্শ রূপ গড়ে তুলেছিলেন। নাটকটির বাংলা রূপান্তর করেছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে তিনি আরো অনেক বিদেশি নাটকের সফল রূপান্তর করবেন। নি:সন্দেহে এ 'নান্দীকার' এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার। এই নাটকের নির্দেশক ছিলেন যৌথভাবে চিন্ময় রায় এবং বিভাস চক্রবর্তী। ব্যক্তি মুখ্য হচ্ছে না, দল গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রচুর লেখা হয়েছে 'ছায়ায় আলোয়', 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু'- ওয়র্কশপের এই তিনটি প্রযোজনা নিয়ে।

'ছায়ায় আলোয়' মূলত প্রশংসিত হয়েছে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত পরিবারের বাস্তবতার কারণে। বিভাস অশোক চিন্ময় সকলেই 'নান্দীকার'- এ 'মঞ্জরী...' ইত্যাদি সুবাদে ন্যাচারালিজমের পাঠ পেয়েছিলেন। এঁরা অনেকেই থাকতেন দমদম এলাকায়, যেখানে নিম্নবিত্ত কলোনিবাসী মানুষ দেখেছিলেন তাঁরা স্বাভাবিক নিয়মেই। এ নাটক যেন নিম্নবিত্ত জীবনের ওপর একটি আধুনিক মহাকাব্য।[৩১]

> বাইরের সামান্য সাহায্য নিয়ে, এবং অদিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য না নিয়েই নিজেরাই নাট্যপ্রযোজনার সমস্ত কাজ হাতেকলমে শিখে নিয়ে ভাল নাটক প্রযোজনা করার উদ্দেশ্যে কলকাতার কয়েকজন তরুণ

> তরুণী নিরীক্ষামূলকভাবে থিয়েটার ওয়র্কশপ প্রতিষ্ঠা করেন।...চরিত্রচিত্রনে এবং সংলাপে অসাধারণ সাহিগত্য-সচেতনতা লক্ষ করা গেছে এই নাটকে।[৩২]

ইতিপূর্বে 'বহুরূপী' চেষ্টা করেছে ক্লাসিকের পাশাপাশি আধুনিককালের নাটককে বাংলা থিয়েটারে জায়গা করে দিতে। সন্দেহ নেই, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি থিয়েটার ওয়র্কশপ বেশি দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছে। পাঁচের দশকের কবি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অন্যতম এক কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন কবিতার পাশাপাশি নাটক লেখায় এলেন, তখন তাঁর নতুন ধারার নাটকগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর বন্ধু 'নক্ষত্র' গোষ্ঠীর শ্যামল ঘোষ। দুর্ভাগ্যবশত এই অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করতে গিয়ে এই গোষ্ঠীর নাট্যবিষয়ক সংবাদ তেমন সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু 'নক্ষত্র'-এর বাইরে 'থিয়েটার ওয়র্কশপ' আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে মোহিতবাবুর দুটি নাটক প্রযোজনা করেছে 'রাজরক্ত' এবং 'মহাকালীর বাচ্চা'। পক্ষান্তরে, সমকালীন আর এক নাট্যকার, যিনি নিজেও অভিনেতা-পরিচালক মনোজ মিত্র-র দুটি নাটকও এই সময়ের মধ্যে অভিনয় করে ওয়র্কশপ, সবগুলির নির্দেশক এবার থেকে এককভাবে বিভাস চক্রবর্তী। 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'নরক গুলজার'।

দুই নাট্যকারের প্রথম দুটি নাটক বহু আলোচিত এবং উচ্চ প্রশংসিত। আধুনিক বাংলা থিয়েটারে দুটি নাটকের স্থান অমোঘ। অবশ্য 'রাজরক্ত' -এর রূপককে সন্দেহের চোখে দেখেছেন কেউ কেউ, বলেছেন –

> নাটকটিতে পাশ্চাত্য রূপকনাট্যের ভঙ্গি খুব স্পষ্ট। সে বিষয়ে কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু নাটকের পরিমণ্ডল এবং চরিত্রের পাশ্চাত্যিকরণ অথবা পাশ্চাত্যসুলভতা নাটকের বক্তব্য বিষয়কে এবং আবেদনকেও যেন খানিকটা দূরবর্তী করে তুলেছে, কারণ এটি এদেশী এবং বাংলা নাটক।[৩৩]

আবার প্রতীক থেকে রূঢ় বাস্তবে আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতীকে চলে যাবার প্রবণতাই অনেক সমালোচককে মুগ্ধ করেছে।[৩৪] ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে রাজাসাহেব চরিত্রে অশোক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের। *সত্যযুগ* লিখছে- রাজরক্ত দেখে মনে হয় না কোন নাটক দেখছি। এ যেন আজকের জীবনের, আজকের সমাজের টুকরো বাস্তব ঘটনাগুলোই স্টেজের ওপর সাজানো হয়েছে। আমি এবং আমার সঙ্গে সব দর্শকই যেন এর এক একটা চরিত্র।[৩৫] ভবেশ দাশ যিনি উত্তরকালে বাংলা থিয়েটারের নানা গুরুত্বপূর্ণ সংকলন এবং সম্পাদনায় নিযুক্ত করবেন নিজেকে, তিনি এই নাটকে বাস্তবতাকে পরিহার করে ইঙ্গিত এবং প্রতীকের আয়োজনে দর্শকমনে এই নাট্যের দীর্ঘস্থায়িতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[৩৬] সার্বিকভাবে নাট্যকারের রাজনীতি চেতনা রিয়্যালিজমের ডকুমেন্টেশনকে এড়িয়ে প্রতীকের এবং 'উপমাশ্রয়ী' সংলাপ ব্যবহারের দরুণ একই সঙ্গে প্রশংসিত এবং সমালোচিত হলেও আগামীদিনে আরো বলিষ্ঠতর নাটকের প্রত্যাশা বাড়িয়েছে।[৩৭]

'রাজরক্ত' যে প্রশ্ন তুলেছিল তার মীমাংসা করে দিয়েছে মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু'। *দর্পণ*-এর সমালোচক লিখেছেন-

> এই নাটকে চাতুরী নেই কিন্তু শ্রেণিসংঘাতের বিষয়টি উপস্থাপনে নেই কোনো সরলীকরণ, চরিত্রসৃষ্টিতেও আছে জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও সযত্ন অনুশীলনজনিত স্বচ্ছ ধারণার সার্থক রূপায়ণ। জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ও অস্তিত্বের এলিমেন্টাল উপস্থাপন, আবার ট্র্যাজিক ও কমিক অভিজ্ঞতার অতি সার্থক সংমিশ্রণ–এই গুণাবলীর দায়ভাগে এই নাটকের অভিনয় একই সঙ্গে বিশুদ্ধ ও গভীর আবেগ এবং স্বচ্ছবোধের সঞ্চারী।[৩৮]

পরিচয়-এর পাতায় এই নাটকের জন্য সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যকারকে তারাশঙ্করের উত্তরসূরি ভাবেন, উৎপল দত্ত বলেন এই নাটকের বিরতিমুহূর্ত তাঁর দেখা থিয়েটারগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আমরা *এপিক থিয়েটার* পত্রিকার একটি নামহীন-তারিখবিহীন আট পৃষ্ঠার প্রবন্ধ পেয়েছি যার নাম 'পি এল টি'-র চোখে থিয়েটার ওয়র্কশপের 'চাকভাঙা মধু'। বাংলায় ব্রেশ্‌টের

রাজনৈতিক স্বরূপ না বুঝে থিয়েটারের যে বাহ্য আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি, তাকে দ্বিধাহীন ভাবে আক্রমণ করে এই প্রবন্ধ বলেছে-

> থিয়েটার ওয়ার্কশপের "চাক ভাঙা মধু" এই ভ্রান্ত ব্রেখ্‌টবাদকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। মনোজ মিত্রের লেখায় ও বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় এ নাটক প্রথমেই তথাকথিত এলিয়েশনের বিরক্তিকর নাট্যহীনতাকে পরিহার করেছে, গল্পকে গল্পের মেজাজ দিয়েছে, নাটককে নাটক করেছে, মুহূর্মুহূ উত্তেজনা এনেছে, ঘটনা ঘটিয়েছে, প্রবল ঘৃণা থেকে শুরু করে স্নিগ্ধ মাতৃত্ব পর্যন্ত সব রসে আনাগোনা করেছে শেক্‌স্‌পিয়ারীয় চালে। আজকাল যেমন অনেকে আবেগকে ভয় করতে শিখেছেন, চরম মুহূর্তে এসে যেমন অনেকে হাস্যকর স্থিরচিত্র উপস্থিত ক'রে পাশ কাটান বা ততোধিক উদ্ভট আধুনিক কবিতা আবৃত্ত শুরু করে হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশকে রুদ্ধ করে রাখেন, থিয়েটার ওয়র্কশপ সেসব বালখিল্যতাকে প্রশ্রয় দেন নি মোটেই।

নাম অথবা স্বাক্ষর না থাকলেও এই লেখার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনায়াসে বুঝিয়ে দেয় এই লেখা উৎপল দত্ত ছাড়া আর কারো নয়।

মনোজ মিত্ররই পরের নাটক 'নরক গুলজার' কিন্তু এই স্বীকৃতি পায় নি। খুশি হতে পারেনি *দর্পণে*-এর সমালোচক[৩৯], *দেশ* পত্রিকা এই সুচারু অভিনয়দক্ষ দলকেও যে সারাক্ষণ চিৎকৃত অভিনয় করতে হল, তার কারণ হিসাবে বলেছেন- নাটকটিতে কিছু নেই।[৪০] *দ্য হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-এর ক্যাপশন হচ্ছে- More comic than political.[৪১]

কিন্তু ভূয়সী প্রশংসা করছে *এপিক থিয়েটার* কিংবা *আনন্দবাজার পত্রিকা*। যে শ্রেণীকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে, *এপিক থিয়েটার* তার প্রশংসা করছে, প্রশংসা করছে সার্বিক অভিনয় এবং প্রযোজনার। *আনন্দবাজার*- এর লেখার সূচনা রীতিমতো লক্ষ করার মতো-[৪২]

> যদি বলি, বাংলা নাটক এই প্রথম তার আত্মশক্তি ফিরে পেলো, তাহলেও বোধহয় সবটুকু বলা হয় না। থিয়েটার ওয়র্কশপের 'নরক গুলজার' তার চাইতে বেশি কিছু দাবি করতে পারে; আরও কিছু বেশি।

কী? যদি সে বলে, পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়, রবীন্দ্রনাথের পরে, এই প্রথম তা মঞ্চস্থ হলো—মনে হয় কারও কিছু বলার থাকবে না।

স্মতর্ব্য, এই নাটক দেখে দর্শক যে শেষ পর্যন্ত খুশিমনে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন, *পরিচয়*-এর সমালোচক সেই কথা তাঁর লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে যে বাংলা থিয়েটারে সমালোচনার কোনো মানদণ্ড নেই, প্রত্যেক লেখক তার পছন্দ এবং জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী সমালোচনা করছেন।

'থিয়েটার ওয়র্কশপের' যে নাটক নিয়ে আমাদের শেষ আলোচনা, তার নাট্যকার পুনরায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকের নাম 'মহাকালীর বাচ্চা'। এই নাটকে ফ্যান্টাসি এসে রাজনীতিকে গুলিয়ে দিয়েছে,[৪৪] এই অভিযোগ ছিল *বারোমাস* পত্রিকার সমালোচক শুভ বসুর, এবং এই লেখার জন্য তিনি পূর্ণেন্দু পত্রীর দ্বারা সমালোচিত হলে পরের সংখ্যায় একটি চিঠিও লেখেন। তাতে তাঁর বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট করেন, কিন্তু কিছু পরিবর্তন করেন না। নাটকটি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে *গ্রুপ থিয়েটার* পত্রিকা,[৪৫] জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় নাট্যরচনার অনেক ফাঁক ফোকর খুঁজে বার করেন, নির্দেশক সেসব মুন্সিয়ানার সঙ্গে সামলালেও যে আগেকার সাফল্য পার হয়ে যেতে পারেন না। তা বলতে দ্বিধা করেন নি *পরিচয়*-এর পাতায়।[৪৬] এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এখনো মনে করতে পারেন, নানা প্রয়োগকৌশলে সমৃদ্ধ ছিল এই প্রযোজনা, মানুষের জঙ্গল হয়ে এগিয়ে আসার দৃশ্য পরবর্তী সময়ে সুমন মুখোপাধ্যায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-তে হুবহু ব্যবহার করেন-অথচ মূলত 'টেক্সট'-এর দুর্বলতায় এই প্রযোজনা দর্শক গ্রহণ না করায় ওয়র্কশপ নাটকটি বন্ধ করে আটের দশকের শুরুতে নতুন নাটক 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' মঞ্চে নিয়ে আসেন।[৪৭]

২

আমরা এই অধ্যায়ে আর কোনো দলের কথা আলাদা করে আলোচনা না করে সমকালীন দলগুলির কিছু বিশেষ প্রযোজনা ধরে গ্রুপ থিয়েটারের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে বোঝবার চেষ্টা করব। আমরা আগেই বলেছি অনেক চেষ্টা করেও আমরা 'থিয়েটার ইউনিট' (শেখর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত) এবং 'নক্ষত্র' গোষ্ঠীর (শ্যামল ঘোষ পরিচালিত) কাজকর্মের তেমন হদিশ করতে পারিনি। কিন্তু এই দুই দলের কর্ণধারের লেখা দুটি মূল্যবান প্রবন্ধের আলোচনা না করে পারছি না। প্রথম লেখাটি লিখছেন শেখর চট্টোপাধ্যায় *দেশ* পত্রিকায় 'মুক্তচিন্তা' সেকশনে ১৯৮৮-৮৯ সালে। তারিখ অজ্ঞাত এই লেখাটি নাট্যশোধ সংস্থানের অভিলেখ্যাগার থেকে সংগৃহীত।

'বিদেশী নাটক ও বাংলা প্রযোজনা'-এই শিরোনামে ব্রেশ্‌ট্‌ অবলম্বনে 'পন্তু লাহা' নামের সফল পরিচালক-রূপান্তরকার হয়েও তিনি দেখান, গণনাট্য-উত্তরকালে প্রচুর নাটকের প্রয়োজনেই একে একে পশ্চিমি নাট্যকাররা এসেছিলেন বাংলায়, সেই ধারায় সত্তরের দশকে ব্রেশ্‌ট্‌ ব্যাপকভাবে চর্চিত হলেন। কিন্তু আশির দশকে এল-

> এক অনিবার্য অবক্ষয়...মৌলিক নাটক একেবারে নেই বললেই চলে...পুরো থিয়েটারটাই যেন কেমন নিশানাহীন, দিশাহারা...অবিমিশ্র নাটক নির্বাচন, যে-নাটকের সঙ্গে বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই, কোন সাযুজ্য নেই, শুধু প্রয়োগের মুনশীয়ানা দেখাবার একটা অপরিণত উল্লাস, একটা বন্ধ্যা ইনটেলেকচুয়ালিস্‌ম্‌-আজকের বাংলাথিয়েটারকে একটা কাণাগলিতে এনে পর্যবসিত করেছে।"

তাহলে বলা যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ের নবনাট্যের সপক্ষতা করছেন। এর সঙ্গে মিলিয়ে যদি শ্যামল ঘোষের 'নবনাট্য: নব্যরীতি'[৪৮] প্রবন্ধটি পড়ি, তাহলে দেখব তিনি নবনাট্যের ভাবনাকে সজ্ঞায়িত করছেন এইভাবে যে নবনাট্যে-

১) মানবিক মর্যাদাস্থাপন, ২) প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী ৩) বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার। এই তিনটি শর্ত নবনাট্যের নাটকে থাকবে বলে তিনিও সংক্ষেপে বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রবেশ করেন। ক্রমে গণনাট্য-উত্তর নাট্যচর্চা সম্পর্কে তাঁর অভিমত-

> নতুন কিছু সংগঠন গড়ে উঠল সত্যিই,কিন্তু তারাও গণনাট্যসঙ্ঘ প্রবর্তিত নব্যরীতির বাইরে নতুন কিছু করে উঠতে পারল না। শুধুমাত্র একটি উপকার লক্ষ্য করা গেল নাটকগুলো উক্ত রাজনৈতিক দলের উগ্র প্রচারকার্যে নিজেদের প্রকটভাবে জড়াতে দিল না।

বোঝাই যায় লেখক কিঞ্চিৎ সরলীকরণ করে যে কথাটাকে ধরতে চাইছেন যে নাটক লেখা এবং প্রয়োগে জটিল জীবনের প্রকাশ নবনাট্যেও দুর্লভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার প্রধান কারণ দর্শকের এবং নাট্যকর্মীদের অনীহা। তাই তিনি নবনাট্যের মধ্যেও দুটি ভাগ করেছেন প্রচীনপন্থী এবং নব্যপন্থী। নব্যরীতিরই নাটককার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বাদল সরকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এরা অন্য ধারার নাটক চর্চা করেন, যার সঙ্গে বক্স অফিস বা বিনোদনের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্রেশ্‌ট্‌ তো বিনোদন ছাড়া থিয়েটারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। আমাদের শেষ আলোচনা তাই সমাজ এবং শিল্পসচেতন কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, যাদের ছাড়া আধুনিক বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

সুদূর বালুরঘাটে বসে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা করে আলোচ্য মতাদর্শের থিয়েটারের শক্তি বাড়িয়ে দেন। অসাধারণ টিম ওয়র্কে অত্যন্ত সফলে এক প্রযোজনা ছিল বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’। মূল নাটকের বীরভূমের ‘উপভাষা’ (এইভাবেই অভিহিত হয়েছে *বারোমাস* পত্রিকার প্রতিবেদকের কলমে[৪৯])-কে এঁরা উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ ভাষায় বদলে নিয়েছেন, স্থানীয় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন, বিবাহ দৃশ্যে তরজা গান, মূল নাটকের শেষে কালীনৃত্যকে বদলে ডাকের সাজে প্রশান্ত মহিষাসুরমর্দিনীর আর্বিভাব-সেও স্থানীয় দর্শকের কাছে

সহজ কম্যুনিকেশনের জন্য, উচ্চগ্রামে ঢাকের বাজনা দিয়ে নাটক শুরু এবং শেষ করেছেন তাঁরা নাটক। বিশেষ করে প্রশংসিত প্রভঞ্জনের চরিত্রে হরিমাধব এবং সঞ্চারিয়ার চরিত্রে তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। *দ্য স্টেটস্‌ম্যান*-এর সমালোচক প্রশংসা করেছেন এঁদের প্রযোজনা 'অনিকেত'- এর, করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে উল্লেখ করেছেন এঁদের 'দেবীগর্জন', 'গালিলেও', 'দেবাংশী' ও 'জল' প্রযোজনার।[৫০] তাঁদের 'গালিলেও' প্রযোজনা সম্বন্ধে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় লেখা হয়-

It is to credit Mr Mukherjee's that he does not reduce the protagonist Galileo's adversaries to a laughable or otherwise denigratory status. প্রযোজনাগত সমালোচনাও কিছু করেছেন সমালোচক।[৫১] The Economic Times-এর সমালোচক এই প্রযোজনার carnival দৃশ্যের খুব প্রশংসা করেছিলেন।[৫২]

বালুরঘাট ত্রিতীর্থের শ্রেষ্ঠ কাজ *দেবাংশী*, কথাকার অভিজিৎ সেনের কাহিনি নিয়ে নাটক। বলা দরকার এঁদের নাট্যের যে সমালোচনাগুলি আমরা পাচ্ছি তা আমাদের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে হলেও আমরা মনে রাখছি মফস্‌সলের ডোল হিসাবে এইসব প্রযোজনা আগেই বালুরঘাটের 'গোবিন্দ অঙ্গন'এ অভিনীত হলেও কলকাতায় পরে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীহার ভট্টাচার্য লিখেছিলেন-

> যেবার এরা প্রথম কলকাতায় আসে,সেবারই তারা নাট্য-সমালোচকদের বিস্মিত করে-প্রশংসামুখর হয়ে ওঠে এবং বিদগ্ধ মহলে সাড়া জাগায়। সেটা ১৯৭২ সাল।[৫৩]

দেশ পত্রিকায় সমালোচক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় শিরোনাম দেন "জাত নাটকের নমুনা 'দেবাংশী'"।[৫৪]

১৯৭২ সালে রাইটার্স বিল্ডিং-য়ে কতিপয় সরকারি কর্মচারি মিলে প্রতিষ্ঠা করে যে *চেতনা* নাট্যদলটি, তার দুটি প্রযোজনা একাধারে রাজনীতিগত দায়বদ্ধতা এবং শৈল্পিক নিরীক্ষায় দীর্ঘকাল বাংলা থিয়েটারকে পুষ্টি জুগিয়েছে, 'মারীচ সংবাদ' এবং 'জগন্নাথ'। এরকমই আর একটি প্রযোজনার কথা আমাদের বলতেই হবে 'সুন্দরম' প্রযোজিত মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা-নির্দেশনা অভিনয়ে সমৃদ্ধ 'সাজানো বাগান'। তাঁর প্রয়াণ গটেছে সদ্য, ১৩ নভেম্বর ২০২৪-এ। অসুস্থ হবার আগে অবধি তিনি বাঞ্ছারামের চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় নিজেই লিখেছিলেন 'মারীচ সংবাদ', কিন্তু 'জগন্নাথ' তিনি লেখেন লু সুন-এর একটি গল্প থেকে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও যতদিন তাঁর শরীর দিয়েছে জগন্নাথের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অভিনেতা-নির্দেশক সুজন মুখোপাধ্যায় সেই চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। নি:সন্দেহে এই তিনটি প্রযোজনা শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্ত-অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগের পর মাইল ফলক হয়ে দেখা দিয়েছে।

৩

'জগন্নাথ'-এর অসাধারণ রিভিউ লিখেছিলেন শ্রী দেবাশিস দাশগুপ্ত *দেশ* পত্রিকার পাতায়। 'বিদেশি অনুপ্রেরণায় বীতশ্রদ্ধ', 'অভিনয় অনুরাগী', 'চলচ্চিত্র অনুরাগী', 'নাটকে আঙ্গিক বিদ্বেষী' এবং 'সমালোচক'- ইত্যাদি ধরণের দর্শকের প্রতিনিধি হয়ে তিনি দেখান, এই নাটকে 'ভালো ফিল্ম দেখার মেজাজ' পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে নাট্যপ্রতিমার চালচিত্রের মতো আঙ্গিকের আয়োজন-এবং সমালোচকের চোখে বেশ কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেও তিনি বলেন- অরুণ মুখোপাধ্যায় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে নাট্যপ্রতিমা রচনা করেছেন, প্রতিবেদক হিসাবে আমি হয়তো বোঝাতেই পারলাম না-সে প্রতিমা কতখানি তিলোত্তমা।[৫৫] নভেম্বর ১৯৭৭-এ প্রকাশিত *কালপুরুষ* পত্রিকায় একসঙ্গে দুটি আলোচনা করেন কল্পনা বিশ্বাস এবং সমীর মুখোপাধ্যায়। কল্পনা এই নাটককে 'সবচেয়ে বেশি

ব্রেখ্‌টীয়' বলে উল্লেখ করে লেখেন- যথার্থ এপিক থিয়েটারের ঐতিহ্য বহন করে 'জগন্নাথ' নাটক একাধারে ঐতিহাসিক ও প্রকাশমুখর। প্রযোজনার সবিশেষ প্রশংসা করেও সমীর মুখোপাধ্যায় শেষে লেখেন-

> যে নাটক আঙ্গিকের বৈভবে এত সমৃদ্ধ, পরিশীলিত অভিনয়ে অলঙ্কৃত ও আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধিকে এত বিস্তৃত করে, সে নাটক কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল ধরে নাড়া দেয় না, আমাদের প্ররোচিত করে না এই গ্লানিময় জীবনকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা নিতে। একটা তাৎক্ষণিক ও বিস্ময় আমাদের আচ্ছন্ন করে মাত্র।[৫৬]

পরিচয়-এ 'থিয়েটার ওয়র্কশপ'- এর অশোক মুখোপাধ্যায় 'জগন্নাথ'- এর সঙ্গে 'থিয়েটার কমিউন'- এর 'দানসাগর' নাটকটি নিয়ে আলোচনা করেন। আবার 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার প্রতিবেদক একসঙ্গে এই দুইয়ের সঙ্গে 'সাজানো বাগান' নাটকেরও আলোচনা করেন। ফলত এই তিন নাটকের পর্যালোচনা শেষ করে আমরা 'শূদ্রক'-এর 'অমিতাক্ষর', কমিউন- এর 'জীবিকা ও প্রস্তুতি' এবং 'নান্দীমুখ'- এর 'পাপপুণ্য' নাটক নিয়ে কিছু কথা বলে ১৯৮০ সালে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র-র গালিলেওর জীবন বিষয়ক আলোচনা দিয়ে এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করব।

গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার কথা আমরা আগেই বলেছি। বলেছি 'সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধ'— এই ক্যাচলাইনের কথা। সেখানে একেবারে প্রথম সংখ্যাতেই একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম – '৭৭-র সমবেত শিল্প: জগন্নাথ-দানসাগত্র-সাজানো বাগান'।[৫৭] গ্রুপ থিয়েটার যে শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা বলবে, পরিবেশনার নানাগুণে আকর্ষক হবে, একথা মনে রেখেও এই তিনটি নাটকে আরো একটা নতুন ছক আবিষ্কার করলেন তাঁরা।

সেই আবিষ্কারের কথা এই তিনটি নাটকের সমস্ত সমালোচনাতেই প্রকাশিত। 'থিয়েটার ওয়র্কশপ'- এর অশোক মুখোপাধ্যায় একটি বড়ো গদ্য লিখলেন *পরিচয়*- এর পাতায়, তাতে 'দানসাগর' এবং 'জগন্নাথ' এই দুটি নাটকের ছোটোগল্প অবলম্বন, সাহিত্য ও নাটকের সম্বন্ধ,

নাটকগুলির প্রয়োগের নতুনত্ব, অভিনয়ের অসামান্যতা খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। বিশেষত 'দানসাগর'- এর মেধো দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'জগন্নাথ'- এর মূল চরিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের আভিনয়িক সমগ্রতার আলোচনা করেছেন তিনি। পরিশেষে বলছেন থিয়েটারের দুর্দিনে এমন এক কড়া নাটক উপহার দিলেন যাঁরা, পরমায়ূ বাড়িয়ে দিলেন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের, সেই থিয়েটার কমিউন ও চেতনাকে অভিনন্দন জানাতেই এত কথা।[৫৮]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দানসাগর' প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য-

> Daansaagar is a strange, disturbing production, a departure from the cheerful money-spinners that dominate the Calcutta theatre at the moment. Nilkantha Sengupta is more realistic than most of the leftists in the theatre...[৫৯]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আদর্শ বনাম আর্থিক জনপ্রিয়তা-সংক্রান্ত আপত্তির ইঙ্গিত রেখেছিলেন, তাকে হয়তো স্পর্শ করে যায় সুন্দরমের 'সাজানো বাগান'। আমরা মনে রাখছি, গ্রুপ থিয়েটারের সামগ্রিক ইতিহাসে 'জগন্নাথ' খুব জনপ্রিয় হয়, এবং অরুণ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় মৃণাল সেনকে তাঁর 'পরশুরাম' (১৯৭৯) ছবিতে অবিকল একই রকম চরিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ব্যবহার করতে প্রণোদনা জুগিয়েছিল, কিন্তু এই সেদিন, ১২ই নভেম্বর ২০২৪ সালে প্রয়াণকাল অবধি মনোজ মিত্রের যে নাটক 'সাজানো বাগান' এবং তাঁর অভিনীত চরিত্র বাঞ্ছারাম কাপালি যে তাঁর পিছু ছাড়ল না, তার কারণ মঞ্চে এই নাটকের চার দশকের জনপ্রিয়তা, এবং তপন সিংহ কর্তৃক এই নাটক অবলম্বনে 'বাঞ্ছারামের বাগান' (১৯৮০) চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং তার বিপুল জনপ্রিয়তা। অথচ এই নাটক সমালোচক সুরজিৎ ঘোষের কাছে আক্রান্ত হয়েছে তার সংলাপের স্থূলতার দরুন, প্রযোজনাতেও অভিনবত্বের অভাব চোখে পড়েছে কারোর কারোর, কিন্তু এই নাটকের জনগ্রাহিতাকে সাধুবাদ জানিয়েছে *থিয়েটার বুলেটিন* পত্রিকা, কারণ যে ফর্মূলা

ছবি ও নাটক তথাকথিত হিন্দি সিনেমা এবং রাজাবাজারের থিয়েটারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে গ্রুপ থিয়েটারের এই নাটক।[৬০]

৪

'সুন্দরম'- এর 'মেষ ও রাক্ষস' প্রযোজনাটিও সমালোচক মহলে তার রূপকথা সুলভ আবরণে অনাচার এবং সংগ্রামের নাটক হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে। পাশাপাশি 'থিয়েটার কমিউন'- এর 'জীবিকা' এবং 'প্রস্তুতি' নাটক দুটিও গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে। 'জীবিকা' নিয়ে আলোচনা *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকায় ১১ জুলাই ১৯৮১ তে, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *মহানগর* পত্রিকায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮২-তে। তিনি একে 'মাটি ঘেঁষা' নাটক বলেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে এই প্রযোজনার প্রশংসা করেছেন দেবাশিস দাশগুপ্ত *দেশ* পত্রিকার পাতায়, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১-তে। *অমৃত* নিয়মিত নাটকের সমালোচনা এবং নাটক বিষয়ে আলোচনা ছাপলেও *অনুক্ত* -র মতো সম্পূর্ণ সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক সাময়িকপত্রে 'প্রস্তুতি' নাটক বিষয়ে প্রকাশিত দীর্ঘ আলোচনা আমাদের কিছুটা বিস্মিতই করে।

দল ভেঙে দল গড়ায় বাংলা থিয়েটারের যে ঐতিহ্য, সেই ধারায় আর দুটি দল এবং তাদের দুটি প্রযোজনার কথা আমরা বলব। কমিউনের 'দানসাগর' টিমের দেবাশিস মজুমদার দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দন সেনগুপ্ত প্রমুখ বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন 'শূদ্রক' গোষ্ঠী এবং তাদের প্রথম প্রযোজনা 'অমিতাক্ষর' বাংলা মৌলিক নাটকরচনার ইতিহাসে এক স্থায়ী আসন করে নেবে। সময়টা অত্যন্ত জটিল ছিল, জরুরি অবস্থা-উত্তর রাজনীতির পচনের চেহারা দেখায় এ নাটক। দেবাশিস দাশগুপ্ত লেখেন-

> বাইরে যদি বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে অশ্লীল নাচ চলে চলুক—সচেতন মানুষের অন্তরে যদি বোধনের বাজনা বাজে—তবে দিন বদলাবেই—শূদ্রক প্রযোজনা এইভাবেই মহিমান্বিত।[৬১]

প্রসঙ্গত আমরা মনে রাখতে চাইব, 'অমিতাক্ষর' প্রযোজনার বছরেই শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালা* নাটক (১৯৭৮) গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পায়, যার সারা নাট্যবিন্যাস জুড়ে আছে মূল্যবোধহীন ক্ষমতার রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রাজনীতির দিকে না গিয়ে ব্যক্তির সংকটে মন দিলেন। তাঁর নবগঠিত দল 'নান্দীমুখ' থেকে তিনি অভিনয় করলেন এক যুগান্তকারী অভিনয়-সমৃদ্ধ নাটক 'পাপপুণ্য', তলস্তয়ের 'পাওয়ার অব ডার্কনেস' থেকে। রূপান্তর-নির্দেশনা এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনয় তাঁরই। *সত্যযুগ* (৩১/০৮/১৯৭৮), *যুগান্তর* (২/৩/১৯৭৮), *লিঙ্ক* (১৪/৬/১৯৭৯), *কালান্তর* (১৯/১/১৯৭৯), *দেশ* (২৪/৩/১৯৭৯) প্রভৃতি পত্রিকায় সপ্রশংস আলোচনা বেরিয়েছে। এর থেকে আমরা কেবল দেবাশিস দাশগুপ্তের *দেশ* পত্রিকার লেখাটির দুটি অংশ বেছে নিচ্ছি।

> সাম্প্রতিককালের থিয়েটারে অনেক কায়দা, অনেক প্রকরণ সত্ত্বেও সত্যিকারের ভাল নাটক, অভিনয় ক্ষমতাই যে প্রযোজনার মেরুদন্ড, সেটা নান্দীমুখ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।
>
> কিন্তু দুটি বিরতিতেই আমি দর্শকদের কথা বলতে শুনেছি কম। মনের ওপর যে চাপ পড়ে সেটা যে কোনো প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও সহ্য করা কঠিন। ...নাটকটি দেখার পড় অনেকে অসহায়বোধ করতে পারেন—নিজেদের গোপনীয়তা বা ভবিষ্যতের কথা ভেবে...তুলনামূলক উপলব্ধিতে থিয়েটার কর্মী যদি আরও ভাল নাটক, আরও পরিশ্রমসাধ্য অভিনয়ে উদ্বুদ্ধ হন তবেই সেটা নান্দীমুখের পুণ্য।

এই মন্তব্যের পরে আর কিছু বলবার অবকাশ বোধহয় থাকে না।

৫

আমরা এই অধ্যায়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি। এতদূর অবধি আলোচনায় আমরা নিশ্চয় বোঝাতে পেরেছি যে একমাত্র দায়িত্বপূর্ণ সমালোচনাই পারে প্রতিনিয়ত যে থিয়েটার হয় এবং অভিনয় শেষে ফুরিয়ে যায়, তার সামাজিক তাৎপর্য এবং অভিনয় ও উপস্থাপনার খুঁটিনাটি

বৃত্তান্তকে কালের হাতে তুলে দিতে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি যে থাকে না তা নয়, সমালোচক নাট্যকর্ম এবং তার কারিগরি বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হলে হয় না, আবার তার বিশ্বসাহিত্য ও সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ থাকা জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত, নাট্য সমালোচনা, সাহিত্য সমালোচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দেশে পেশাদার নয়, যারা এই লেখা লেখেন, তারা মূলত ভালোবাসা থেকে লেখেন। ধরণী ঘোষের মতো খুব কম লোকই এক্ষেত্রে পেশাদার ছিলেন। আবার অতি দক্ষ এবং দায়িত্ববান পেশাদার সমালোচক হবার দরুন নাট্যকর্মের নানা দিক থেকে কেউ কেউ প্রয়াত শ্রী ঘোষের মতো কঠোর হতে পারেন, এবং পরিচালকের সঙ্গে তার বিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা সেই বিরোধ-সঙ্ঘাতের নমুনা দু-এক ক্ষেত্র ছাড়া তেমন পাই নি। বস্তুত আমাদের আলোচ্য সময়ের পর উৎপল দত্তের সঙ্গে ধরণী ঘোষের পত্রযুদ্ধ চলেছে তা আমরা জানি। কিন্তু নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮০ সালে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র'র উদ্যোগে ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ নির্দেশিত শম্ভু মিত্র অভিনীত 'গালিলেওর জীবন' নাটকের টিকিটে 'প্রবেশানুমতি সংরক্ষিত' কথাটি প্রকাশিত হয়।[৬২] উদ্দেশ্য ছিল সমালোচক ধরণী ঘোষ ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'থিয়েটারের বন্ধু' না মনে করে তাঁদের প্রবেশে বাধাদান করা। প্রস্তাবটি অনিবার্যভাবে ছিল শম্ভু মিত্রের, 'মুদ্রারাক্ষস'- এর মতো এই নাট্যেও পাঁচদিন আগে টিকিটের লাইন পড়ে, এবং পত্রিকার পাতা ভরে ওঠে বাদানুবাদে। নাট্যকেন্দ্রর পক্ষ থেকে যে চিঠি ছাপা হয় তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় (এ নাটকের বাংলা অনুবাদক) রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ এবং প্রতিবাদী পত্র লিখেছিলেন তাপস সেন এবং পবিত্র সরকার। বলা বাহুল্য, সেইসব চিঠির শিরোনামে এবং ভাষাভঙ্গিতে যথোচিত শালীনতার অভাব প্রকট হয়েছিল। আমাদের পরিতাপ এই, সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য আন্দোলন এইভাবে ব্যক্তির সাফল্য, জনপ্রিয়তা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই

দশকেই নবনাট্যের যুগাবসান ঘটিয়ে তোলে, যার রেশ গিয়ে পড়ে গত শতাব্দীর নয়ের এবং নতুন শতকের নাট্যে।

উৎস ও টীকা :

১) লিটারালি বিজনদার তখন কলকাতায় যে অবস্থা, কোনো কাজ নেই, কিচ্ছু নেই, লিটারালি খেতে পান না...উনি অগোছালো মানুষ, উনি ডিসিপ্লিনড নন-উনি সেটা মেনেও নিয়েছেন। তাই ওঁর থিয়েটার সত্যিই কোথাও পৌঁছায় না। একথা বলেও শমীকবাবু দেখাচ্ছেন, বিজন ভট্টাচার্য-র নাট্যভাষাই ছিল স্ব-তন্ত্র, এবং তাঁকে যথেষ্ট critical support দেওয়া হয় নি।-

বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক, *থিয়েটারের জলহাওয়ায়,* ফেব্রুয়ারি ২০০৭, শেখর সমাদ্দার, মিলি সমাদ্দার (সম্পা), প্যাপিরাস। পৃ ৯১-৯২।

২) চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন, 'নবনাট্য আন্দোলন-এ নামের শেষ হোক', সেপ্টেম্বর ১৯৬২, *বহুরূপী* ১৪ পৃ ৩৮-৪০। বর্তমানে স্ব-নামে *শম্ভু মিত্র রচনাসমগ্র* ২, জানুয়ারি ২০১৭, আনন্দ, শাঁওলী মিত্র (সম্পা), পৃ ৯-১১য় মুদ্রিত।

৩) চক্রবর্তী, বিভাস, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৫, *দেশ* , সাগরময় ঘোষ (সম্পা) দ্র 'নাটক নিয়ে', জানুয়ারি ২০০৯, কিশলয় প্রকাশন, পৃ ৮৪-৮৯।

৪) *অমৃত* , ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

৫) 'সূর্যশিকার', ২০ চৈত্র, ১৩৭৭, *আনন্দবাজার পত্রিকা* । সমালোচক লক্ষ করেছেন ব্রেশ্‌টের 'লাইফ অব গালিলেও' নাটকের প্রভাব আছে এই নাটকে, এবং 'সরলীকৃত হলেও শ্লেষ, বিদ্রূপ, নাট্যদ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে এই নাটকেও আছে 'কল্লোলে'-র মতো সম্মোহন-শক্তি।

৬) *টিনের তলোয়ার* সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য *এপিক থিয়েটার* ২৩ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে সংগৃহীত। কেবল পি এল দেশপাণ্ডের লেখাটি নাট্যশোধ সংস্থানে রক্ষিত একটি টাইপড্ শিটে প্রাপ্ত।

৭) *দু:স্বপ্নের নগরী* বিষয়ে সমালোচক মহলের নানা তর্ক, এই নাটক বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার সংকলন পাওয়া যাবে *থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক* বইতে। দ্র ওই, জানুয়ারি ২০১৩, দেবাশিস রায়, কালিন্দী ব্রাত্যজন, পৃ ১৫৪-২৭২।

৮) না। তাঁর শেষদিকের প্রযোজনাগুলি দেখে আমরা খুশি হতে পারছিলাম ...নিজেকে নিজেই আর অতিক্রম করতে পারছেন না তিনি।

স্মরণ: উৎপল দত্ত, সম্পাদকীয়, *স্যাস* পত্রিকা, ১০ম বার্ষিকী সংখ্যা ১৯৯৩, সত্য ভাদুড়ী (সম্পা)।

৯) *গণশক্তি* , ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮।

১০) *এপিক থিয়েটার* , ১৯৭৮, তৃতীয় সংখ্যা।

১১) উৎপল দত্ত : একটি সাক্ষাৎকার, বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ,* সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মলয় রক্ষিত, পৃ ২০৫।

১২) *বারবধূ* সংক্রান্ত বিতর্কের জন্য দ্র ৭ নং সূত্রের বইটি, পৃ ২৩১-২৫৩।

১৩) দত্ত, উৎপল, জানুয়ারি ১৯৮৩, *গিরিশ মানস* , এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স।

১৪) উৎপল দত্ত : একটি সাক্ষাৎকার, বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ,* সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মলয় রক্ষিত, পৃ ২১৩।

১৫) 'আমি খুব একনিষ্ঠ', রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র সাক্ষাৎকার, *চর্চা,* প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি কেন্দ্র চর্চার মুখপত্র, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা শেখর সমাদ্দার অভিজিৎ করগুপ্ত পৃথ্বীশ রাণা, সত্য ভাদুড়ী (সম্পা), পৃ ৭৮।

১৬) *আনন্দবাজার পত্রিকা* (৮ ডিসেম্বর ১৯৭২), *যুগান্তর* (১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২), *কালান্তর* (২২ ডিসেম্বর ১৯৭২)। *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* -র সমালোচক অবশ্য খুবই আক্রমণ করেছিলেন, নাটকটিকে, তথ্যের ঘাটতির জন্য, উপস্থাপনার নানাবিধ ত্রুটির জন্য, বিনোদিনীর ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের নাচকে বলেছেন 'scandalous'। লেখার ধরন থেকে অনুমেয় এটি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা।

১৭) Hindusthan Standard, 'Strindberg sans subtlety', Oct 18, 1974.

১৮) *অমৃত*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

১৯) *দেশ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

২০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৮১, 'কলকাতার থিয়েটার কার জন্য?', পরিবর্তন।

২১) না আন্তিগোনের ঠিক আগে...তারপরে আবার সেভেন্টি ফাইভে যখন আন্তিগোনে হচ্ছে তখন গ্রান্টটা যাতে কনটিনিউড হয়, এজন্য প্রফেসর নূরুল হাসানের সঙ্গে দেখা করলাম...আমি খুব একনিষ্ঠ, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র সাক্ষাৎকার, *চর্চা*, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি কেন্দ্র চর্চার মুখপত্র, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা শেখর সমাদ্দার অভিজিৎ করগুপ্ত পৃথ্বীশ রাণা, সত্য ভাদুড়ী (সম্পা), পৃ ৮৩।

২২) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪।

২৩) *দেশ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫।

২৪) *কৃতিবাস*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৫।

২৫) ক্রেয়ন-বেশী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাম - ভুমিকায় কেয়া চক্রবর্তী, দুজনেরই অভিনয় অসাধারণ। প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার মঞ্চে একটি আলোক-বলয় যখন নি:স্পন্দ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেষ্টন করে তখন তাঁকে মনে হয় যেন একটি গ্রীক ভাস্কর্য। যেন পাথর দিয়ে তৈরি, তাঁর ক্রেয়ন দৃশ্যত শক্তিমান, প্রবল যাঁর আত্মপ্রত্যয়। স্মৃতি-উচ্চারণের পর্যায়ে এই আপাত-বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রচ্ছন্ন ব্যথার দ্যোতনা অনুভব করি। শিল্পীর অভিব্যক্তিতে কখনও-বা প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রটির বিমূঢ় ভাব। শেষে আবার সেই ভাস্কর্য দৃশ্যমান-তাঁর রাজা তখন সর্বহারা, অসহায়তার একটি করুণ মূর্তি। আন্তিগোনের প্রতিজ্ঞা-কঠিন নি:শঙ্ক ছবিটি উপস্থিত করেছেন। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৯/০৮/১৯৭৫। *দেশ* পত্রিকার সমালোচক প্রবোধবন্ধু অধিকারী বলছেন পরীক্ষামূলক অভিনয়ে নান্দীকার গোষ্ঠীর যদি কোনো সুনাম থেকে থাকে তবে এই নাটক তার শেষ মাত্রা ছুঁয়েছে...আন্তিগোনে বিপ্লবের নাটক, বিরোধের দূরন্ত ছবি। (১০ জানুয়ারি ১৯৭৬)। *অমৃত* পত্রিকার ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সংখ্যায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবধি *আন্তিগোনের* প্রশংসা করেছেন। চল্লিশ বছর পরে, পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে সেইসব প্রশংসা নিয়েও বিরূপ মন্তব্য করছেন এবং নিজের প্রথম নির্দেশনা প্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য প্রযোজনা নয়, অন্য কোনো বিরোধের বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয়।

২৬) দ্র দেবশঙ্কর হালদারের প্রকাশিতব্য সাক্ষাৎকার, *সময় নাট্যভাষ*, বিশেষ সংখ্যা, বাংলা থিয়েটারে অভিনয়।

২৭) মজুমদার, স্বপন, মে ১৯৮৮, *বহুরূপী* ১৯৪৮-৮৮, বহুরূপী প্রকাশনা, পৃ ৮৮।

২৮) *থিয়েটার অর্ণব*, জুলাই ১৯৭৯।

২৯) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৭/০৫/১৯৭৯।

৩০) *দৈনিক কালান্তর*, ১৪/০৭/১৯৬৭।

৩১) *অমৃত*, ২৪/১১/১৯৬৭।

৩২) *নবকল্লোল*, পৌষ সংখ্যা, ১৩৭৪।

৩৩) *যুগান্তর*, ১৫/০২/৭২।

৩৪) *অমৃত*, ১৯/০২/১৯৭১।

৩৫) *সত্যযুগ*, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৭২।

৩৬) *দর্পণ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৩৭) *অনুষ্টুপ*, চতুর্থ সংখ্যা, মে ১৯৭২, বিশ্বাস অনিল (সম্পা)।

৩৮) *দর্পণ*, ১৮/০৮/১৯৭২। লেখাটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'দর্পণের নাট্য সমালোচক' নামে প্রকাশিত।

৩৯) (দর্পণের সমালোচক), *দর্পণ*, বিংশ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১লা এপ্রিল ১৯৭৭।

৪০) *দেশ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৮, 'অসফল কৌতুক, অসফল প্রতীক'।

৪১) *The Hindusthan Standard*, 7th April, 1977.

৪২) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২/০৬.১৯৭৭।

৪৩) *পরিচয়*, জুলাই ১৯৭৭।

৪৪) "... 'মহাকালীর বাচ্চা'র মতো ভঙ্গিসর্বস্ব নাটক কেন যে তাঁদের টানল তা বোঝা মুশকিল"। *বারোমাস*, জানু-ফেব্রু, ১৯৭৯, সেন অশোক (সম্পা)।

৪৫) *গ্রুপ থিয়েটার*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭৯।

৪৬) *পরিচয়*, পৌষ ১৩৮৫।

৪৭) সাক্ষাৎকার, ১০/১০/২০২৪।

৪৮) *বহুরূপী*, ১৪ শ বিশেষ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬২, মিত্র, শম্ভু (সম্পা)।

৪৯) চক্রবর্তী, অমলেন্দু, *বারোমাস*, জুন-জুলাই ১৯৭৯, সেন, অশোক (সম্পা)।

৫০) *দ্য স্টেটসম্যান*, ১/১২/১৯৯০।

৫১) *Amrita Bazar Patrika*, 2 October, 1982.

৫২) *The Economic Times*, October 3, 1982.

৫৩) *মহানগর*, মে ১৯৮৪, বসু সমরেশ (সম্পা)।

৫৪) *দেশ*, ১১/০৮/১৯৮৪।

৫৫) *দেশ*, ১৯ চৈত্র, ১৩৮৩।

৫৬) ওই পত্রিকার জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৮-এ এই দুটি লেখার মতামত বিষয়ে আর এক নাট্য সমালোচক-গবেষক নির্মল সাহা বেশ কড়া এক চিঠি দেন এবং পূর্বোক্ত লেখকরা তার উত্তর দেন।

৫৭) অস্বাক্ষরিত এই লেখা সম্ভবত সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহার, দ্র *গ্রুপ থিয়েটার*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মে-জুলাই ১৯৭৮, পৃ ১৪৫-৫০।

৫৮) *পরিচয়*, নভেম্বর ১৯৭৭।

৫৯) *The Hindusthan Standard*, 13 february, 1977.

৬০) *থিয়েটার বুলেটিন*, দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংকলন, ১৯৭৮।

৬১) *দেশ*, ২২ জুলাই ১৯৭৮।

৬২) অযথা উদ্ধৃতি কন্টকিত না করতে চেয়ে এই প্রসঙ্গে যে তথ্যাবলী আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাদের উল্লেখ আমরা করলাম না, কেননা সম্পূর্ণ বিতর্কের ইতিহাস দুটি গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। সে দুটি হল-

ক) মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, জানুয়ারি ২০০০, *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*, দে'জ, পৃ ৬০৩-৬০৪।

খ) রায়, দেবাশিস, জানুয়ারি ২০১৩, *থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক*, কালিন্দী ব্রাত্যজন, পৃ ৩৩৮-৩৪৪।

পঞ্চম অধ্যায়

আট দশক থেকে নতুন শতাব্দীর নাট্যচর্চা, সমালোচনার অভিমুখ

১৯৮০ সালে ‘কলকাতা নাট্যকেন্দ্র’- র ‘গালিলেওর জীবন’ নিয়ে প্রযোজক সংস্থা এবং সমালোচকদের বিরোধ যে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছিল, আগের অধ্যায়ের আলোচনা আমরা সেখানেই শেষ করেছি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচনা পরিসরও ওইটুকুই।

আমরা নিশ্চয়ই এমন কোনো সহজ এবং সরল সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি না যে ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ‘মতাদর্শ’-এর থিয়েটার বা ‘নবনাট্য আন্দোলন’-এর সমাপ্তি ঘটে গেল। বস্তুত থিয়েটারে সমবেত প্রয়াস বা যাকে বলে ‘কম্বিনেশন নাইট’ সেই শিশিরকুমার-অহীন্দ্র চৌধুরিদের যুগ থেকেই বহুবার ঘটেছে, ঘটবে পরবর্তীকালেও। কিন্তু নিজের গড়া দল ‘বহুরূপী’ ছাড়ার পর এবং ‘নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি’- র জন্য অভিনীত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে পুনরাভিনয়ের পর আবার ‘নাট্যকেন্দ্র’ নামক নতুন সমবায়ে বিভিন্ন নাট্যদলের নির্দেশক-অভিনেতাদের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের ইতিহাস নিঃসন্দেহে মতাদর্শের থিয়েটারের তুলনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক পেশাদারিত্বের প্রবণতাকে অনেক বেশিই নির্দেশ করে। এই প্রবণতা আরো প্রতিষ্ঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫-তে স্থাপিত বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ‘অন্য থিয়েটার’-এ।[১] এই নাট্যদল আমাদের সমান্তরাল থিয়েটারে ভিন্ন এক গণতন্ত্রীকরণের সূচনা করে, সেটা এই যে নাটকের অভিনেতা হতে গেলে সেই দলের সদস্যপদ থাকা জরুরি নয়, প্রযোজনা ভিত্তিক চুক্তির বিনিময়ে দক্ষ কিংবা সময়ে সময়ে নামী অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বাইরে থেকে নেওয়া যেতে পারবে। যতদুর জানি, অন্য থিয়েটারের সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের মধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়মবদ্ধ করে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই ধারার ব্রাত্য বসু সুমন মুখোপাধ্যায় কৌশিক সেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই এই ভাড়া করা অভিনেতা ব্যবহার

করেন, প্রযোজনাকে সফল রূপ দেন এবং ক্রমশ প্রায় সর্বত্র গ্রুপ থিয়েটার নাম্নী কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যদলগুলির এইটিই ধরণ হয়ে ওঠে। ফলত শূন্য দশকের থিয়েটারে আমরা সিনেমা সিরিয়ালের মতো থিয়েটারেও প্রচুর সংখ্যক 'ফ্রি লান্স' পেশাদার নামধারী নট নটী দেখতে পাব—বলা বাহুল্য যোগ্যতা এবং দায়বদ্ধতার বিচারে অনেকেই এর উপযুক্ত নন। অবশ্য এই বিচার কতটা সমীচীন হচ্ছে তার আলোচনাক্ষেত্র আলাদা, আমরা কেবল বলতে চাইছি, এই আধা পেশাদার, আধা কমিটেড থিয়েটারে ছয় ও সাত-আটের দশকের ধারাবাহিকতা থাকবার সম্ভাবনা কমে যায়।

দ্বিতীয় যে দিকটার কথা বলা দরকার, গত শতাব্দীর বিশ-তিরিশ দশক থেকে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে নানাভাবে ভাগ হয়ে হয়ে যে কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), সে তার শরীকদের সঙ্গে নিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করছে ১৯৭৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় তার কার্যকাল শুরু করছে। এর পরের বছরে, ১৯৭৮-এ নৃপেন্দ্র সাহা- রমণ মাহেশ্বরীরা প্রকাশ করছেন 'সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধ'- এর ক্যাপশনসহ ত্রৈমাসিক নাট্যপত্রিকা *গ্রুপ থিয়েটার*। মূলত পশ্চিমবঙ্গ এবং বৃহত্তর বাংলার মফস্সলের নাট্যচর্চাকে নানাভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগানোই এই পত্রিকার কাজ ছিল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ অবধি বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকরী ভূমিকার ফলে কৃষি, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়নের মতো নাট্যক্ষেত্রও হয়ে উঠেছে উর্বরা, প্রচুর নাটকের দল তৈরি হচ্ছে মফস্সলে-তৈরি হচ্ছে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা মঞ্চ।

এদিকে শহর কলকাতায় নতুন কিছু দলের যেমন জন্ম হচ্ছে যেমন 'গণকৃষ্টি', 'লোককৃষ্টি', 'সংসৃতি', 'কসবা অর্ঘ্য', 'দৃশ্যপট', 'রঙ্গপট' ইত্যাদি, তেমনই দল ভেঙে দলের সংখ্যাও বাড়ছে—যেমন 'বহুরূপী' ভেঙে 'চেনামুখ' (১৯৮১), 'পঞ্চম বৈদিক' (১৯৮৫), 'নান্দীকার' ভেঙে 'নান্দীমুখ'

(১৯৭৭), 'নান্দীপট' (১৯৭৮), 'শূদ্রক' ভেঙে 'সংস্তব', 'গন্ধর্ব' থেকে 'নক্ষত্র', 'থিয়েটার ওয়র্কশপ' ভেঙে 'অন্য থিয়েটার' বা 'রঙ্গলোক' ইত্যাদি। প্রচুর নাটকের দল, প্রচুর প্রচুর নাটক, নাট্যকর্মী— কিন্তু সেই অনুপাতে প্রেক্ষাগৃহ এবং দর্শক নেই। সরকার এগিয়ে আসছেন হল তৈরিতে, গড়ে উঠছে শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, জেলায় জেলায় রবীন্দ্র সদন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭-তে সরকার গড়ে তুলছেন পশ্চিমববঙ্গ নাট্য আকাদেমি। এই সর্বাত্মক সহযোগিতা কতটা নাট্যশিল্প ও শিল্পীর স্বার্থে আর কতটা দলীয় সমর্থক বৃদ্ধির প্রয়োজনে, সে বিচার করবেন আগামী দিনের গবেষক।

দিল্লিতেও এই সময়ের মধ্যে নানান বদল ঘটে। ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজ বাসভবনে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন। দেশ জুড়ে দাঙ্গা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছর ডিসেম্বরে নান্দীকার গোষ্ঠী 'জাতীয় নাট্যমেলা' শুরু করে।[২] ডিসেম্বর ৬, ১৯৯২-তে রাস্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘের সমর্থকেরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙে। দীর্ঘদিন ধরে ওই বিতর্কিত জমি নিয়ে মামলা চলে, এর মধ্যে দুবার করে ইউ পি এ সরকার আর এন ডি এ সরকারের শাসনকাল বদল হয়। অবশেষে ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি এককভাবে সরকার গঠন করে এবং ২০১৯-এ সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বিচারপতি চন্দ্রচূড় সিং-এর এজলাসে উক্ত জমিতে রামমন্দির গড়ে তোলার আদেশ হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষে গ্যাট চুক্তি ইত্যাদির দরুণ 'গ্লোবালাইজেশন' এবং 'বাজার অর্থনীতি' আমাদের অধিকার করে। আমাদের বিচারে, বাম রাজনীতির অন্তর্গত বিচলন, স্রোত-প্রতিস্রোত এবং পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটকের নাম 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', নাটককার ব্রাত্য বসু, নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা সংসৃতি হলেও এটিও পূর্বোল্লেখিত 'কম্বিনেশন নাইট' তথা পেশাদারী অভিনয়ের চূড়ান্ত নমুনা।[৩]

নতুন শতাব্দী, নাট্যচর্চা, সমালোচনার অভিমুখ

আমরা বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে আমূল বদল এসে গেল, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যে যাচ্ছি না। তবে আমরা অবশ্যই বলতে চাইব যে নতুন প্রজন্মের নির্দেশক-নাটককাররা অথাকথিত মিডিয়ার যে সমর্থন আদায় করে নিলেন কিছুটা কাজের আর কিছুটা অন্য ক্ষমতার দৌলতে, সেই অভিঘাতও বেশিদিন টিঁকল না। মধ্য থেকে নাট্য সমালোচনা বিষয়টাও এই সময়ে কিছুটা অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কিনা সেটাও ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিগত এক যুগে অন্তত *আনন্দবাজার পত্রিকা* ও তার অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়াতে নাট্য সমালোচনার জন্য তেমন জায়গা বরাদ্দ নেই, ব্যতিক্রম *দ্য টেলিগ্রাফ* এবং *দেশ* পত্রিকা। *আজকাল* পত্রিকাতেও অবশ্য মধ্যে মধ্যে নাটকের সমালোচনা বেরোয়।

এই সময়কালে থিয়েটারের নিয়মিত কলমচি যাঁরা ছিলেন বা আছেন, তাঁরা নিজেদের বা অন্যদের লেখা নাট্য সমালোচনাগুলিকে বই আকারে স্থায়ী রূপ দিতে চাইছেন, যে প্রবণতা আগের দশকগুলিতে দেখা যায় না। এই দলে অধ্যাপক পবিত্র সরকারকে পাব, কিন্তু তিনি নিতান্ত ব্যতিক্রম। উল্লেখ করা দরকার আগেকার দশকগুলিতে যাঁরা নিয়মিত নাট্যসমালোচনার কাজ করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী ধরণী ঘোষ (*দ্য স্টেটসম্যান*, শ্রী দেবাশিস দাশগুপ্ত, শ্রী সুরজিৎ ঘোষ, শ্রী দীপেন্দু চক্রবর্তী প্রয়াত। একমাত্র দীপেন্দুবাবুরই একটি বই পাওয়া যায়।[৪] শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক আনন্দ লাল অনেকদিন এই কাজটি থেকে বিরত আছেন। এঁদের মধ্যে আনন্দ লালের কোনো বইয়ের হদিশ আমাদের জানা নেই, কিন্তু পবিত্র সরকারের মতো শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কথা আমাদের উল্লেখ করতেই হবে।[৫] এঁরা বাদে সুব্রত ঘোষ [৬], আশিস গোস্বামী, শেখর সমাদ্দার,[৭] মলয় রক্ষিত [৮], দেবাশিস রায়, অংশুমান ভৌমিক প্রমুখ নিজেদের অথবা অন্যদের করা নাট্য সমালোচনাকে সংকলিত করেছেন। আশিস

গোস্বামী এবং দেবাশিস রায় মূলত সংকলক। বেশ মূল্যবান ও সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য এই বইগুলি পাঠক ও গবেষকমহলে আদৃত হয়ে উঠছে।[৯] বলা বাহুল্য, এঁদের সকলেই নয়া শতাব্দীর সমালোচক নন, ব্যতিক্রম একমাত্র অংশুমান ভৌমিক। ফলত তাঁর *দহনান্ত থেকে কোজাগরী*[১০] এবং এ *নাটকে কোনো বিরতি নেই*[১১]- এই দুটি বইতে এই সময়ের অনেক নাটকের সমালোচনা পাওয়া যাবে। শ্রী ভৌমিক এখনও *দ্য টেলিগ্রাফ* ও অন্যান্য পত্রিকায় নাট্য সমালোচনা লেখেন। এ বাদে আর যাঁরা এই ক্ষেত্রে বই প্রকাশ করেছেন, নাট্য সমালোচনা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই যে যার মতো করে আলোচনা করেছেন। এঁদের লেখা পড়ে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় থিয়েটার বিষয়টিকে কে কীভাবে বুঝতে চান বা নিজের অহমিকাকে কম গুরুত্ব দিয়ে নাট্যের অভিঘাতকে বেশি মূল্য দেন। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, তাঁদের কথাবার্তা অথবা তাদের লেখার সূত্রে অন্য অনেকের কথাবার্তা বিষয়টিকে কোন বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সম্প্রতি প্রকাশিত *ব্রাত্যজন* নাট্যপত্রে এই নিয়ে একটি গোলটেবিল আলোচনাও প্রকাশ পেয়েছে।[১২]

সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, নতুন শতাব্দীর থিয়েটার অনেক বেশি আঙ্গিকের আধুনিকতায় ভর করে চলে, থিয়েটারের রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা তার বিষয়গত দিকগুলি নিয়ে ততটা ভাবে না। জীবনানন্দ দাশের ভাষায় এই সময়ের থিয়েটার সম্পর্কে বলতে হয়—কেবলই দৃশ্যের পর দৃশ্যের জন্ম হয়।

সম্ভবত দৃশ্যগত অভিঘাত বেড়ে যাবার কারণে চটজলদি একধরণের সমালোচনা, প্রশংসা বা নিন্দা সামাজিক মাধ্যমে আজকাল খুবই দেখা যায়, কিন্তু নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে সেগুলির স্থায়ী কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না। সেই কারণে এখন সময় সংরক্ষণের (আর্কাইভিং-এর)।[১৩] থিয়েটার প্রতি সন্ধ্যায় জন্মায় প্রতি সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। একমাত্র উপযুক্ত সমালোচনা এবং সংরক্ষণ পারে কালের হাতে তার গুণাগুণ বিচারের ভার তুলে দিতে।

উৎস ও টীকা

১) অন্য থিয়েটার সম্পাদক শ্রী দিলীপ দত্তের সূত্রে জ্ঞাত।

২) দ্র সমাদ্দার, শেখর, অগাস্ট ২০২২, 'জাতীয় নাট্য ও নান্দীকার', *আধুনিকতা ও বাংলা থিয়েটার*, মৌহারি, পৃ ৬১-১১৬।

৩) প্রথম অভিনয়, আকাদেমি মঞ্চ, ১৭ জুলাই, ২০০২। নির্দেশক শ্রী দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে জ্ঞাত।

৪) চক্রবর্তী, দীপেন্দু, জানুয়ারি ২০১৯, *বিষয় যখন নাটক*, দে'জ।

৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, *থিয়েটারের জলহাওয়ায়*, সমাদ্দার, শেখর, সমাদ্দার মিলি (সম্পা), প্যাপিরাস। ২০১১, *থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা*, লালমাটি।

৬) ঘোষ, সুব্রত, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, *থিয়েটারের দর্শক দর্শকের থিয়েটার*, সিগনেট প্রেস।

৭) সমাদ্দার, শেখর, ২০২২, *সম আলোচনা ও বাংলা থিয়েটার*, লালমাটি।

৮) রক্ষিত, মলয়, ২০১৮, *থিয়েটারের জন্য ধর্মাবতার*, লালমাটি।

৯) রায়, দেবাশিস (সম্পা), জানুয়ারি ২০১৪, *অনন্তের ভিতরে ঢেউ*, কালিন্দী ব্রাত্যজন। ওই, জানুয়ারি ২০১৩, *থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক*, পূর্বোক্ত। গোস্বামী, আশিস, জানুয়ারি ২০১১, *বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা*, প্রতিভাস।

১০) ভৌমিক, অংশুমান, অক্টোবর ১৯১৬, *দহনান্ত থেকে কোজাগরী*, মৌহারি।

১১) ওই, সেপ্টেম্বর ২০২০, *এ নাটকে কোনো বিরতি নেই*, পূর্বোক্ত।

১২) *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র*, পঞ্চদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২ বসু, ব্রাত্য (সম্পা)।

১৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ডিসেম্বর ২০২৩, 'আর্কাইভ ভাবনা', *অন্য The Other*, চক্রবর্তী বিভাস (সম্পা), পৃ ৯১-৯৯।

বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ/পত্রিকা পঞ্জি

গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, ১৯২৭/ ১৯৭৭, *গিরিশচন্দ্র*, স্বপন মজুমদার (সম্পা), দে।

গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, আশ্বিন ১৩২০, *গিরিশচন্দ্র*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স।

গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, প্র প্র আশ্বিন ১৩৩০, পুনঃপ্রকাশ মহালয়া, ১৩৮৩, সেকালের নাট্যচর্চা সিরিজ, *রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সুনীল দত্ত (সম্পা)।

গোস্বামী, আশিস, জানুয়ারি ২০১১, *বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা*, প্রতিভাস।

ঘোষ, শঙ্খ, ১৯৬৯/১৯৭৮, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, দে'জ।

ঘোষ, শঙ্খ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, *থিয়েটারের কথা*, প্যাপিরাস।

ঘোষ, সুব্রত, *থিয়েটারের দর্শক দর্শকের থিয়েটার*, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সিগনেট প্রেস।

চক্রবর্তী, দীপেন্দু, *বিষয় যখন নাটক*, জানুয়ারি ২০১৯, দে'জ।

চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, আগস্ট ১৯৯৭, *বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ, গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র*, পরিবেশক পুস্তক বিপণী।

চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ, আগস্ট ২০০০, *সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার*, সংসৃতি ।

চৌধুরী, অহীন্দ্র, মহালয়া ১৩৬৬, *বাঙালীর নাট্যচর্চা*, শঙ্কর প্রকাশনী।

চৌধুরী, অহীন্দ্র, মাঘীপূর্ণীমা ১৩৬৫, বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র, *গিরিশ বক্তৃতামালা*, বুকল্যান্ডস।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ৭ আগস্ট ২০১৬, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ, ১৩৯৮, *রবীন্দ্র রচনাবলী* সুলভ, ১৩ খন্ড ।

দত্ত, উৎপল, জানুয়ারি ১৯৮৩, *গিরিশ মানস*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স ।

দাশ, ভবেশ (সম্পা), নভেম্বর ২০১৭, *অজিতেশ*, পরম্পরা প্রকাশন ।

দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ, ১৩৩৫, *গিরিশচন্দ্র*, কালীতারা প্রেস ।

দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ, *বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত*, দোলপূর্ণিমা ১৩৫৪, শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

দাসী বিনোদিনী, পৌষ ১৩৬১, *আমার কথা*, কথাশিল্প, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য (সম্পা)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ২০২২, *থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা*, লালমাটি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, *থিয়েটারের জলহাওয়ায়*, শেখর সমাদ্দার, মিলি সমাদ্দার (সম্পা), প্যাপিরাস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক, বইমেলা ২০১৯, *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, মলয় রক্ষিত (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)।

বসু, দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৩৩, *শকুন্তলায় নাট্যকলা*, বরেন্দ্র লাইব্রেরি।

বসু, ব্রাত্য, ভাদুড়ী, সত্য (সম্পা), সেপ্টেম্বর ২০১৮, *গিরিশ কথা*, মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র।

বসু, মন্মথমোহন, ১৮৪৮, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, *গিরিশ বক্তৃতা মালা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, শঙ্কর, আগস্ট ১৯৮২, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০)*, ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

ভট্টাচার্য, শঙ্কর, জুলাই ১৯৯৩, *নাট্যাচার্য শিশির কুমার*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

ভট্টাচার্য, শঙ্কর, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)*,২য় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ।

ভাট্টাচার্য, বিজন, জানুয়ারী ১৯৯০, *নবান্ন*, প্রমা প্রকাশনী ।

ভৌমিক, অংশুমান, অক্টোবর ১৯১৬, *দহনান্ত থেকে কোজাগরী*, মৌহারি ।

মিত্র, শম্ভু, জানুয়ারী ২০১৪, সমস্যার একটি দিক, *রচনা সমগ্র ১*, আনন্দ পাবলশার্স।

মুখোপাধ্যায়, অরূপ, ২০১০, *উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

মুখোপাধ্যায়, তপতী (সম্পা), ১৯৭৮, *জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বিজন ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা*, সংস্কৃতি স্মারকপত্র ।

রক্ষিত, মলয়, ২০১৮, *থিয়েটারের জন্য ধর্মাবতার*, লালমাটি ।

রায়, অমরেন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ (দ্বিতীয় সং ১৯৫৬), *গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

রায়, দেবাশিস (সম্পা), জানুয়ারি ২০১৩, *থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক*, কালিন্দী ব্রাত্যজন ।

রায়, দেবাশিস (সম্পা), জানুয়ারি ২০১৪, *অনন্তের ভিতরে ঢেউ*, কালিন্দী ব্রাত্যজন ।

রায়, রথীন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পা), *গিরিশ রচনাবলী, ১ম খন্ড*, সাহিত্য সংসদ ।

রায়চৌধুরি, সুবীর, মজুমদার, স্বপন (সম্পা), ১৯৭২, *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

সমাদ্দার, শেখর, ২০২২, *সম আলোচনা ও বাংলা থিয়েটার*, লালমাটি ।

সমাদ্দার, শেখর, আগস্ট ২০২২, *আধুনিকতা ও বাংলা থিয়েটার*, মৌহারি ।

সরকার, পবিত্র, এপ্রিল ২০০৮, *নাটকের সন্ধানে*, প্রতিভাস ।

সরকার, পবিত্র, বৈশাখ ১৪১২, *আন্তন চেকভ; বিষয় নাটক*, মৌহারি ।

সরকার, পবিত্র, মার্চ ২০০৮, *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, অখন্ড, দেজ সংস্করণ ।

সান্যাল, কৌশিক, *নবীন থিয়েটার, ১৯৯৭*, পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৮, অনুষ্টুপ ।

সেন, কুমুদবন্ধু, ১৩৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, *গিরিশচন্দ্র*, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স ।

সেন, কুমুদবন্ধু, পৌষ ১৩৪২/ ডিসেম্বর ২০১৬, *গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার*, তালপাতা ।

সেহানবীশ, চিন্মোহন, নভেম্বর ১৯৬০, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন ।

স্যাস, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, জানুয়ারি ১৯৯৬, সত্য ভাদুড়ী (সম্পা)।

ইংরেজি গ্রন্থসূচি

Goodman, Randolph, 1961, 1978, Drama on Stage, Colombia University.

Mukherji, Sushil, ?, The Story of The Calcutta Theatre, Bagchi & Company.

P.Guhathakurta, *The Bengali Drama, ITS ORIGIN AND DEVELOPMENT*, 1930, KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO LTD, LONDON.

Styan,J.L., *The Dramatic Experience*, 1971, Cambridge University Press.

Styan,J.L, *Modern Drama in Theory and Practice*, 1981, Vol I-III, Cambridge Univrsity Press.

ইংরেজি পত্রপত্রিকা

Amrita Bazar Patrika, 2nd October, 1982.

Amrita Bazar, 8th October 1944.

The Economic Times, October 03, 1982.

Time Out New York theater critic David Cote.

The Hindusthan Standard, 13th February, 1977.

The Hindusthan Standard, 18th October, 1974.

The Hindusthan Standard, 7th April, 1977.

The Statesman, 1st December 1990.

The Statesman, 22 December 1954.

বাংলা পত্রপত্রিকা

অনুষ্টুপ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ১৯৭২, অনিল বিশ্বাস (সম্পা)।

অমৃত, ২৩ মাঘ ১৩৭৬।

অমৃত, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

অমৃত, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

অমৃত, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

আজাদ, ২১ মার্চ ১৯৫৭।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২/০৬/১৯৭৭।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১/০৫/১৯৬২।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১/০৬/১৯৬৫।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ চৈত্র ১৩৭৭।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২/০৮/১৯৬৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯/০৮/১৯৭৫।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮/০২/১৯৯১।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮/১২/১৯৭২।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৪।

আনন্দবাজার, ১৩/০৭/ ১৯৫৪।

আসর, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৬৯, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭০।

ইত্তেকাফ, ২৮ মার্চ ১৯৫৭।

এপিক থিয়েটার, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২।

এপিক থিয়েটার, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৭৮।

কথাকৃতি, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

গণশক্তি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮।

গন্ধর্ব, জানুয়ারি ১৯৬৫।

গন্ধর্ব, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৩।

গ্রুপ থিয়েটার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মে-জুলাই ১৯৭৮ ।

গ্রুপ থিয়েটার, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭৯ ।

চর্চা, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫।

চিত্র ও নাট্য জগৎ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭০ ।

জনতা, ৩১/০৫/১৯৬৬ ।

থিয়েটার অর্ণব, জুলাই ১৯৭৯।

থিয়েটার বুলেটিন, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯৭৮।

দর্পণ, ০১/০৪/১৯৭৭।

দর্পণ, ১৬/০৪/১৯৭১।

দর্পণ, ১৭/০৬/১৯৬০।

দর্পণ, ১৮/০৮/১৯৭২।

দর্পণ, ১৯/০৭/১৯৬৮।

দর্পণ, ৩০/০১/১৯৭০।

দর্শক, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

দেশ, ১১/০১/১৯৭৫।

দেশ, ১১/০৮/১৯৮৪।

দেশ, ১৩/০১/১৯৭৮।

দেশ, ১৯ চৈত্র ১৩৮৩।

দেশ, ২/০৩/২০১৯।

দেশ, ২২/০৭/১৯৭৮।

দেশ, ২৮/০৯/১৯৭৪।

দেশ, ২৯/১০/১৯৮৫।

দেশ, ৩০/০৮/১৯৬৯।

দৈণিক কালান্তর, ১৪/০৭/১৯৬৭।

দ্বন্দ্ব, ১ জুন ১৯৬৮।

নবকল্লোল, পৌষ সংখ্যা, ১৩৭৪।

নাট্যচিন্তা, ১৭ বর্ষ, এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৯৯, রথীন চক্রবর্তী।

নাট্যপত্র ঘরে বাইরে, জুন ২০০২, শেখর সমাদ্দার (সম্পা)।

পথিকৃৎ, অক্টোবর ১৯৬৪, শারদ সংখ্যা।

পর্বান্তর, জানুয়ারি ১৯৯৫।

পরিচয়, ৩৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।

পরিচয়, জুলাই ১৯৭৭।

পরিচয়, নভেম্বর ১৯৭৭।

পরিচয়, পৌষ ১৩৮৫।

পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৬১।

পাদপ্রদীপ, আশ্বিন ১৩৬৩।

বহুরূপী ০৬, ১জুলাই ১৯৫৮।

বহুরূপী ১৪, সেপ্টম্বর ১৯৬২।

বহুরূপী ৩৩, নবান্ন স্মারক সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৯।

বহুরূপী ৩৪, নবান্ন-স্মারক সংখ্যা, জুন ১৯৭০।

বহুরূপী ৩৮, মে ১৯৭২।

বহুরূপী ৪৮, অক্টোবর ১৯৭৭।

বহুরূপী ৫০, অক্টোবর ১৯৭৮।

বহুরূপী ৬৯, ১ মে ১৯৮৮।

বহুরূপী ৭০, বিশেষ বহুরূপী-প্রযোজনা ২, অক্টোবর ১৯৮৮।

বারোমাস, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, পঞ্চদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২।

মহানগর, মে ১৯৮৪।

যুগান্তর, ১৫/০২/১৯৭২।

যুগান্তর, ২৫/০৮/১৯৬৯।

রূপ-মঞ্চ, চতুর্দশ বর্ষ, সংখ্যা-৭-৮, পৌষ মাঘ।

রূপ-মঞ্চ পত্রিকা, আগস্ট ১৯৬০।

সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৫৭।

সংস্কৃতি, আগস্ট ২০০০। নাট্য সমালোচনার দর্পণে বাংলা থিয়েটার।

সত্যযুগ, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৭২।

সপ্তাহ, ০২/০৮/১৯৬৮।

সংস্কৃতি সংবাদ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বিজন ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা, ৫মে ১৯৯৭।

স্যাস, ১০ম বার্ষিকী সংখ্যা ১৯৯৩, সত্য ভাদুড়ী (সম্পা)।